

ছোট দে র

শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

হাজী মুহম্মদ মহসীন

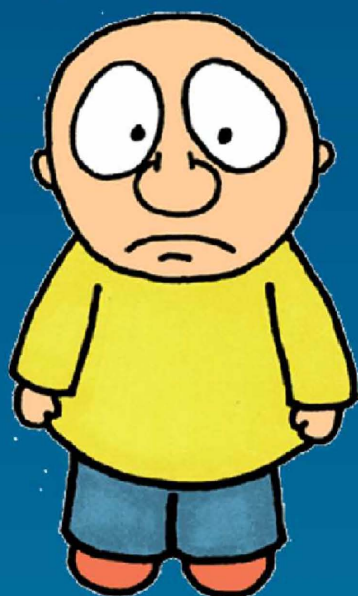
মাহফুজ সিদ্দিকী



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!



Visit Us at
Banglapdf.net

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

ছোটদের
শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

হাজী মুহম্মদ মুহসীন
মাহফুজ সিদ্দিকী

হাতেখড়ি

হাজী মুহম্মদ মুহসীন

- প্রকাশকাল ☐ একুশে বইমেলা ২০০৪
প্রকাশক ☐ আবু মুসা সরকার .
হাতেখড়ি
৩৭ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭৫১৮১
- স্বত্ব ☐ প্রকাশক
বর্ণ বিন্যাস ☐ জামাল
বি. পি. কম্পিউটার্স
মুদ্রণ ☐ গাউছিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৫/খ/২ রজনী চৌধুরী রোড
গেভারিয়া ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪১৩৬৭৪
- প্রচ্ছদ ☐ নাজিব তারেক
মূল্য ☐ ৬০ টাকা

ISBN 984-635-136-4

উৎসর্গ
হাজী মুহম্মদ মুহসীন স্মরণে

ভূমিকা

হাজী মুহম্মদ মুহসীন 'দানবীর' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি নিজের সুখ-স্বাস্থ্য আরাম-আয়েশী উপেক্ষা করে, গরীব, অসহায় ও দুঃস্থদের জন্যে নিজের অর্থকরি ও ধনসম্পদ দান করে গেছেন। দরিদ্র-অভাবী ও দুঃস্থদের সুখ-শান্তি ও স্বস্তির জীবনের জন্যে তিনি সারাজীবন অবিবাহিত থেকে যান। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এবং চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠান করেন। কৃষিকাজে উন্নয়নের জন্যে সেচব্যবস্থা করেন এবং অসংখ্য পুকুর খনন করেন। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরিদ্রজনদের খোঁজ খবর নিতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাদের দান খয়রাত করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দান-খয়রাতের মাসোহরার প্রবর্তন করেন। তিনি মুহসীন ট্রাস্ট ও মুহসীন বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন তার বেঁচে থাকা সময়েই। ট্রাস্টের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হত আর বৃত্তির মাধ্যমে মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হত। এখনও ঢাকা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, কলকাতা ও হুগলির বহু ছাত্র-ছাত্রী মুহসীন বৃত্তি পেয়ে থাকে। হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো দয়ালু ও দানবীর এই উপমহাদেশে আর একজন নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে হাজী মুহম্মদ মুহসীন এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিজে পৈত্রিক সূত্রে সম্পদশালী ছিলেন। উপরন্তু তার বোনের বিশাল সম্পত্তিরও মালিক হন। কিন্তু সব ধন সম্পদ তিনি দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষের জন্যে ব্যয় করেন। আজও ঢাকা, যশোর, খুলনা, কলকাতা ও হুগলিতে মুহসীনের তৈরী অনেক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও পুকুর কালের সাক্ষী হিসাবে রয়েছে।

হাজী মুহম্মদ মুহসীনের মতো দয়াদর্শিতা আদর্শ মানুষের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ছোটদের জানা আবশ্যিক। তারা যদি মুহসীনের মতো জীবন গড়ে তুলতে পারে এবং তার মতো কর্ম সম্পাদন করতে পারে তাহলে তাদের জীবন সার্থক। বইটি ছোটদের আদর্শ জীবন গঠনে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক

ছোটদের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সিরিজ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
পল্লীকবি জসীম উদ্দীন
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু
কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মণ্ডলানা ভাসানী
গুস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
জীবনানন্দ দাশ
বেগম রোকেয়া
লালন শাহ
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
মরমী কবি হাসন রাজা
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
নবাব সিরাজদ্দৌলা
স্বামী বিবেকানন্দ
মাস্টারদা সূর্য সেন
তিতুমীর
কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দিন
বীরাসনা সখিনা
ঈশা খাঁ
হাজী মুহম্মদ মুহসীন

দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসীনের নাম বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে জানে না, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন গরীবের অকৃত্রিম বন্ধু। গরীবের জন্য তার মন সব সময় কাঁদতো। গরীবের কথা শুনলেই তিনি অকাতরে দান খয়রাত করতেন। নিজের সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ সম্পদ তিনি দরিদ্র জনগনের জন্য দান করে গেছেন। এমনকি নিজের জীবনকে পর্যন্ত দরিদ্র অভাবী জনদের জন্যে উৎসর্গ করে গেছেন।

গরীব, দুঃখী, অভাবী মানুষের দুঃখ লাঘবে তিনি তার নিজের জীবনের যাবতীয় সুখ-সুবিধা, আরাম-আয়েশকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন— নিজে বিয়ে করে সংসার পর্যন্ত করেননি।

তার বোন মনুজান তাকে বলেছিলেন—

‘ভাইজান, অনেক দেশ তো ঘুরলেন, বয়সও অনেক হলো, অর্থ সম্পদও যথেষ্ট আছে এবারে আপনার জন্য সুন্দর লাল টুকটুকে একটি বউ দেখি।’

উত্তরে মুহসীন বল্লেন—

‘এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সার্থকতা শুধু এখানেই— পরের উপকার সাধন করা। যা ক’টা দিন বেঁচে আছি মানুষের উপকার করে যেতে দিন।’

ভগিনী মনুজান অভিমানের সুরে বলেছেন—

‘আমার কি ভাইয়ার বউ দেখতে ইচ্ছা করে না? একটি সুন্দর গোছানো

সংসার থাকবে- সেখানে স্বামী-স্ত্রী-সন্তান সুখের সাগরে দিবারাত্র অতিবাহিত করবে। আমি সে ছোট্ট শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করবো। এ ইচ্ছাটা কি আমার হতে পারে না? নাকি এমন ইচ্ছা করা অন্যায়?’

মুহসীন ভগিনীকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন এবং বলেন-

‘না বোন, এ দাবি কোনো অন্যায় দাবি নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক দাবি, যা প্রতিটি মানুষ করে থাকে। সকল মানুষই চায় একটি সুন্দর গোছানো সংসার। সেখানে প্রেম-ভালবাসা, আদর- যত্ন, আমোদ-আহলাদের ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিবে। কিন্তু বোন যারা গরীব-তারাও কিন্তু এরূপ আশা করে। কিন্তু ভাগ্যের দোষে তাদের সে সাধ আহলাদ বাস্তবরূপ নেয় না। স্বপ্নই থেকে যায়। আমি হয়তো তোমার আবদার রক্ষার জন্য আর দশটা মানুষের মতো বিয়ে করে, সংসার পেতে আমার সাধ আহলাদ পূরণ করলাম। কিন্তু ওরা- ঐ যে দরিদ্রজন, যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ জন তাদের অবস্থার পরিবর্তন কে করবে? জানো তো আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত করলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সে দানের ডবল তিনডবল আখেরাতে দান করবেন। আর আখেরাতই হচ্ছে মানব জীবনের আসল জায়গা- চিরস্থায়ী স্থান।’

মনুজান একরকম হতাশ হয়ে বললেন-

‘বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চলেছি বলে এতবড়ো লেকচার দিলে। তাহলে কি ধরে নেবো তুমি বিয়ে করবে না।’

মুহসীন ধীর গলায় উত্তর দিলেন-

‘হ্যাঁ বোন। আমি আমার নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের জন্যে গরীব দুঃখী মানুষকে বঞ্চিত করতে পারবো না। আমি একাকী এ ভূবনে এসেছি একাই এখান থেকে চলে যাবো।’

হাজী মুহম্মদ মুহসীন বিয়ে করেননি- অবিবাহিত জীবন যাপন করেন তিনি।

১৭৩২ সালে পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলাধীন এক বিত্তশালী ও বনেদী পরিবারে হাজী মুহম্মদ মুহসীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেঁচে ছিলেন ৮০ বছর।

মুহসীন যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুঘল সাম্রাজ্য অস্তাচলের দিকে। সম্রাট আওরঙ্গজেব মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। মুর্শিদকুলী খাঁর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তার কন্যা জিন্নাতুন্নেসার স্বামী সুজাউদ্দৌলা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি বিহার উড়িষ্যা রাজ্যকে বাংলার সাথে যুক্ত করেন।

মুহসীনের জন্মগ্রহণের ৮ বছর পর অর্থাৎ ১৭৪০ সালে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু নবাব সরফরাজ খাঁর অযোগ্যতার কারণে নবাব আলীবর্দী খাঁ বাংলার মসনদে আসীন হন। ষোল বছর তিনি কৃতিত্বের সাথে বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। আলীবর্দী খাঁ রাজধানী মুর্শিদাবাদে অবস্থান করতেন।

রাজধানী মুর্শিদাবাদ থাকার কারণ এই— দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে ১৭৮০ সালে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৭০৭ সালে ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। সেই থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে থাকে এবং সেখানে নবাব আলীবর্দী খাঁ বিরাট সুরম্য প্রাসাদে থেকে (যার নাম হীরাখিল) রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

নবাব আলীবর্দী খাঁর ছিল তিন কন্যা। ঘষেটি বেগম, আমেনা বেগম ও জেবুন্নেসা। তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তিন কন্যারই বিবাহ দেন। পূর্ণিয়া, ঢাকা এবং পাটনার তিন সুবেদার ছিলেন তার তিনকন্যার স্বামী।

ঘষেটি বেগমের গর্ভে কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। আমেনা বেগম ও জেবুন্নেসার গর্ভে একজন করে ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। এ অবস্থায় আলীবর্দী খাঁর তিন কন্যার জামাতাই মৃত্যুবরণ করেন।

আলীবর্দী খাঁ তাই বিধবা তিন কন্যাকেই তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ হীরাখিল প্রাসাদে তার নিজের সাথে রাখেন।

জেবুন্নেসার ছেলের নাম শওকত জঙ্গ আর আমেনা বেগমের ছেলের নাম সিরাজউদ্দৌলা আলীবর্দী খাঁ তার দুই নাতীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

আর তাই রাজকার্য পরিচালনার সময় নাতী সিরাজউদ্দৌলাকে সাথে নিয়ে দরবারে বসতেন। আলীবর্দী খাঁর আশা ছিল, তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে তার উত্তরাধিকার করে যাবেন।

নবাব আলীবর্দী খাঁ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার নবাবী দান করেন। সিরাজউদ্দৌলার অভিষেকের সময় দাদু আলীবর্দী খাঁ নতুন নবাবের উদ্দেশ্যে একটি উপদেশ বা নির্দেশ রেখে যান। সেটি হলো নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেন কখনও ইংরেজদের বাংলায় প্রশ্রয় না দেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার দাদুকে কথা দিয়েছিলেন, তিনি কখনও কোনো কারণে বাংলায় ইংরেজদের সুযোগ সুবিধা দেবেন না।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার নবাবী কুসুমাস্ত্রীর্ন ছিল না। ছিল কষ্টক যুক্ত। ঘষেটি বেগম ও জেবুন্নেসার রোষে পড়েন তিনি। ঘষেটি বেগম চেয়ে ছিলেন তিনি বাংলার শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করবেন। এই অভিসন্ধিতে তিনি রাজ দরবারের উজির নাজিরদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তার উদ্দেশ্য ছিল ষড়যন্ত্র করে তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দী করবেন এবং শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে সিংহাসনে বসবেন।

খালা ঘষেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের কথা ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কথা নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছে পৌছে। তিনি কালবিলম্ব না করে সে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং পাটনায় চলে যান। সিরাজউদ্দৌলা দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করে ঘষেটি বেগমকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন এবং কারারুদ্ধ করে রাখেন।

কিন্তু তাতে সিরাজউদ্দৌলার শান্তি ফিরে এলো না। কারণ, পূর্নিয়ায় তার খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ করেন। তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার মসনদ থেকে সরানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিরবে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে ছুটলেন পূর্নিয়ার দিকে খালাতো ভাই শওকত জঙ্গকে দমন করতে।

ঘোরতর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে শওকত জঙ্গ নিহত হলেন। হাজার হলেও খালাতো ভাই তাই সিরাজউদ্দৌলার মন বিষণ্ণ হলো। বিষাদ মনে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

ষেষটি বেগম ও শওকত জঙ্গের বিদ্রোহ দমন করলেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা ষড়যন্ত্রের হাত হতে রেহাই পেলেন না। দরবারের বয়োজ্যেষ্ঠ উজির-নাজির-সিপাহসালার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসন সহ্য করতে পারেন না। বিশেষ করে সিপাহসালার মীরজাফর নবাব হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

সিপাহসালার মীরজাফর নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ইংরেজ বনিক লর্ড ক্লাইভের সাথে গোপন চুক্তি করেন। তিনি নবাবী প্রাপ্তির বিনিময়ে লর্ড ক্লাইভকে প্রচুর উপটোকন দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তার সে প্রতিশ্রুতি শুধু মুখে নয়— তিনি লিখিত দেন প্রতিশ্রুতির কথাগুলো।

সিপাহসালার মীরজাফর দরবারের প্রভাবশালী উজির নাজির জগতশেঠ, উমিচাঁদ ও রায়দুর্লভ প্রমুখকে তার সাথে নিয়ে জোট বাঁধতে সমর্থ হন। লর্ড ক্লাইভ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার এ সুযোগকে কাজে লাগানোর আশ্রয় প্রয়াস চালান। কারণ, লর্ড ক্লাইভের এতে নিজস্ব লাভ তো রয়েছেই— তিনি প্রচুর অর্থ— সম্পদ লাভ করতে পারবেন। তাছাড়া ইংরেজ সম্প্রদায়ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে গর্ববোধ করবে।

এরপরও ক্লাইভের ইচ্ছা— বাংলায় যে কেউ নবাব হোক তাতে তার কিছু যায় আসে না। চুক্তি মোতাবেক অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তিই তার ব্যক্তিগত লাভ, সাথে ব্রিটিশ শাসকও তার উপর সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং ছলে-বলে-কৌশলে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন থেকে সরাতে হবে এবং সেখানে মীরজাফরকে বসাতে হবে।

সিপাহসালার মীরজাফর ও লর্ড ক্লাইভ দু'জনের গোপন ষড়যন্ত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চরম আকার ধারণ করে। এই ষড়যন্ত্রের পরিণাম স্বরূপ নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের যুদ্ধ বেঁধে যায়।

বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশী নামক স্থানে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে সিপাহসালার মীরজাফর তার বিশালবাহিনী নিয়ে চূপ করে থাকেন—

তার দোসর ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিনি ও তার সৈন্যরা অস্ত্রধারণ করলো না। ফলে যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সস্ত্রীক রাজধানী মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে তিনি মীরজাফরের পুত্র মীরনের হাতে বন্দী হন। কারাগারে থাকাকালীন মীরণের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ সিরাজউদ্দৌলাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ধূর্ত ইংরেজ বনিক লর্ড ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদের নবাব বানান।

কিন্তু ইংরেজরা মীরজাফর নবাব হলেও তাকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ, তাদের ধারণা, যে ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তাকে কী করে বিশ্বাস করা যায়। তাছাড়া, দেনা-পাওনা নিয়ে মীরজাফর ক্লাইভের মধ্যে প্রথমে দ্বন্দ্ব তারপর বিরোধ শুরু হয়। মীরজাফরকে নবাব বানানোর বিনিময়ে শর্ত অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ ছাড়াও তাকে খুশি করার জন্যে অর্থ সম্পদ মীরজাফরের কাছে দাবি করেন।

এতে মীরজাফর অসন্তুষ্ট হন। তবু উপায় নেই বুঝে এবং ক্লাইভকে সন্তুষ্ট না করলে তার নবাবী থাকবে না— তাই তিনি ক্লাইভের অর্থ সংগ্রহে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

কিন্তু রাজকোষে যে অর্থ-সম্পদ ছিল তাতে ক্লাইভের দাবি পূরণ সম্পূর্ণ হলো না, তাই মীরজাফর রাজপ্রাসাদের মূল্যবান আসবাবপত্র এমনকি থালাবাসন পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হলেন। তিনি ইংরেজদের দাবি পূরণের চেষ্টা করেন অন্যদিকে গোপনে পর্তুগীজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে গোপনে সতর্কতার সাথে যেমন ষড়যন্ত্র করেছিলেন তেমনিভাবে ক্লাইভের বিরুদ্ধে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু ইংরেজ ধূর্তজাতি। ক্লাইভ ধরে ফেলেন মীরজাফরের ষড়যন্ত্র। তিনি গোপনে অভিযান চালিয়ে পর্তুগীজদের পরাজিত করেন এবং মীরজাফরকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তারই মেয়ের জামাই মীরকাশিমকে নবাব পদে বসান।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও বার বার নবাব পরিবর্তন—এতে বাংলার শাসন কার্য পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি হয়। কৃষি কাজে, শিল্পকাজে নানান প্রতিবন্ধকতা নেমে আসে। বাংলার অবস্থা নানা দিক থেকে খারাপ হয়ে দাঁড়ায়।

ফলে ১৭৭০ সালে বাংলায় দেখা দেয় এক অকল্পনীয় দুর্ভিক্ষ। এতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বর্ণিত আছে ইংরেজরা ইউরোপ থেকে মেথর ও কুকুর এনেছিল এদেশের মানুষের লাশ সরানোর জন্য। যেহেতু এখানকার শকুনের পক্ষেও এত লাশ নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না

উইলিয়াম হানটার লিখেছেন— তখনকার বাংলার জনসংখ্যা ৩ কোটির প্রতি ১৬ জনে ৬ জন মৃত্যুবরণ করেন।

অন্যদিকে ইংরেজ বনিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চ ক্ষমতাসালী কর্মকর্তা লর্ড ক্লাইভের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিযোগ ওঠে। পার্লামেন্টারী তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়—১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত লর্ড ক্লাইভ ও কর্মচারীগণ বাংলা বিহার উড়িষ্যা থেকে যে পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করেছিল তা তখনকার দিনে ৯ কোটি টাকা।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড মেকলে তার Essay on Lord Clive গ্রন্থে লিখেছেন—

‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বা সরকারের স্বার্থে নয় বরং কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বার্থেই তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল।’

এইসব ঘটনা অর্থাৎ— আলীবর্দী খাঁর নবাব হওয়া, পলাশীর প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়, লর্ড ক্লাইভের উৎকোচ গ্রহণ, অকল্পনীয় দুর্ভিক্ষে অসংখ্য নর-নারী— শিশুর প্রাণহানী ইত্যাদি দুঃখজনক ঘটনা হাজী মুহম্মদ মুহসীনের আমলেই ঘটে।

তাছাড়া, হাজী মুহম্মদ মুহসীন কয়েক বছর নবাব আলীবর্দী খাঁর দরবারে চাকরি করেন। কিন্তু রাজ দরবারের কাজকর্ম, কুটিলতা-জটিলতা, হানাহানি, রেষারেষি, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি মুহসীনের ভালো লাগে না। তিনি তার মানসিকতার সাথে কিছুতেই খাপ

খাওয়ায়ে নিতে পারেন না, তাই তিনি চাকরি ছেড়ে দেন।

নবাব আলীবর্দী খাঁ তাকে যথেষ্ট সম্মান করেন। চাকরি না ছেড়ে দিতে অনেক অনুরোধ উপরোধ করেন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তাকে বলেন—

‘আপনি বড়ই উদার ও মহত্ব ব্যক্তি— কিন্তু উদারতা ও মহত্ব কখনও সম্পদ এনে দিতে পারে না, সম্পদ রক্ষা করতে পারে না। ধন সম্পদ আয় করতে কুটিলতা জটিলতার সাথে নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন লাগে। ধন সম্পদ রক্ষা করতেও এসবের প্রয়োজন পড়ে। উদারতার স্থান কোনোক্ষেত্রেই নেই।’

জবাবে হাজী মুহম্মদ মুহসীন বিনয়ের সাথে বলেন—

‘জাহাপনার বক্তব্য যথার্থ, কিন্তু আমি এসব রাজকীয় ব্যাপারে নেই। দেশের গরীব দুঃখী মানুষের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে। তাদের দুঃখের কথা আমার প্রাণে সব সময় বাজে। আমি যদি তাদের জন্যে সামান্য কিছু করতে পারি— আমি আমার জীবন ধন্য মনে করবো।’

আলীবর্দী খাঁ বুঝিয়েও হাজী মুহম্মদ মুহসীনকে রাজ দরবারে ধরে রাখতে পারলেন না। মুহসীন নবাবের চাকরি ত্যাগ করে চলে আসেন।

চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর মুহসীনের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে গেল। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, ক্ষমতার লালসায় পরস্পরে হানাহানি, দুর্ভিক্ষে অসংখ্য নর-নারীর মৃত্যু মুহসীনের মন উদভ্রান্ত করে তোলে। তিনি সাব্যস্ত করলেন, তিনি দেশ ভ্রমণে বের হবেন।

মুহসীনের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ কোনো কঠিন কাজ ছিল না। কারণ, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তার পিতামাতা ছিলেন না। কোনো ভাই ছিলেন না। তিনি একা— শুধু তার এক সৎবোন ছিল। কাজেই সাংসারিক বা পারিবারিক এসব ঝামেলা সাধারণত থাকে— যে জন্যে, যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে ঘর ছেড়ে বের হয়ে বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব হয় না; সেসব ঝামেলা মুহসীনের ছিল না। তাই মন অনুযায়ী মুহসীন বেরবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি ইরাক, ইরান, জর্দান, বাহরাইন, কুয়েত, সিরিয়ায় অবস্থান করেন। এসব দেশে তিনি যে শুধু ঘুরে বেরিয়েছেন তা নয়। এসব দেশের

বুজুর্গ ব্যক্তিগণের কাছে কোরান, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন ও শিক্ষালাভ করেন। ইরাক, ইরান, তুরস্ক, জর্দান ও সিরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের বুজুর্গব্যক্তিদের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ শেষ করে তিনি মিশর যাত্রা করেন।

মিশরের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহু প্রাচীন। বলা হয়— মিশরেই বিশ্বের প্রথম শিক্ষা— সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় ঘটে। মিশরের তৎকালীন রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থাপিত আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ও এখানে বিশ্বের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষের লিখিত ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন দলিলপত্রের বয়স কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর। এবং পাওয়া গেছে মিশরে।

মিশরের সবচেয়ে পুরনো বইয়ের নাম ‘দি বুক অব দি ডেডস্’ বই খানির প্রকৃত নাম Entrence on Light অর্থাৎ আলোর জগতে প্রবেশের পথ। মৃত ব্যক্তির দাফন-শাসন, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রক্রিয়া পদ্ধতি বইখানির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বইখানি লিখিত হয়েছিল PAPYRUS প্যাপিরাস গাছের ছাল দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী এক প্রকার কাগজ (PAPYRI) এর উপর। বর্ণমালা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মিশরীয়দের যেমন বিশেষ অবদান ছিল, তেমনি তারা আবিষ্কার করেছিলেন লেখার উপযোগী এই চমৎকার উপাদানটি।

‘দি বুক অব দি ডেডস্’ কবেকার তা জানা যায়নি। তবে এ বইটার যে কপি পাওয়া গেছে সেটার বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি। এসব বই দেয়া হতো রাজা ও গন্যমান্য ব্যক্তির কবরের মধ্যে শবাধারের পাশে— যাতে তাদের আত্মা অনেক কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে দেবতা অসিরিস (OSIRIS) এর সঙ্গে একীভূত হয় এবং অমরত্ব লাভ করে। বইখানির বেশিরভাগ জুড়ে আছে ক (KA) বা আত্মার কথা।

বইখানি লেখা হয়েছিল মূলত হায়ারেটিক (HIERATIC) লিপি দিয়ে, তবে পাণ্ডুলিপির যেসব অংশ অলংকৃত বা পরিশোধিত ছিল, সেগুলো লেখা হয়েছিল হায়ারোগ্লিফিক (HIEROGLYPHIC) লিপি দিয়ে।

সেই প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে লেখালেখির প্রচলন শুরুই হয়নি তখন মিশরে তিন প্রকারের লিপির প্রচলন ছিল। আদিতে লেখার কাজে যে লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল তার নাম হায়ারোগ্লিফিক অর্থাৎ এটি ছিল পবিত্র লিপি। এ লিপি শুধু পুরোহিতরাই ব্যবহার করতেন এবং ব্যবহার করতেন কেবল মূল্যবান শিলালিপি খোদাই, দলিল দস্তাবেজ লেখা, রাজ রাজরাই ফরমান জারি ইত্যাদি কাজে।

মিশরীয় ভাষা লেখার কাজে হায়ারোগ্লিফিক লিপি খ্রীষ্টপূর্বের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি চালু ছিল। হায়ারোগ্লিফিক লিপি পাওয়া গেছে, তা আবিষ্কৃত হয়েছে এক হাজার কবর থেকে এবং তা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার সাতশত সাতাত্তর বছর আগের।

হায়ারোগ্লিফিক লিপির বেশিরভাগ তৈরি ছিল নানা পশু পাখির ছবি দিয়ে। অর্থাৎ পঁচা, ঈগল, সিংহী, সারস, হাঁস ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয়েছিল মিশরীয় বর্ণমালা। তাদের কথাগুলো ছিল অপূর্ব। বর্ণমালা ছিল অসাধারণ রূপমাধুর্যে মণ্ডিত। প্রাচীন মিশরীয়রা যে সৌন্দর্য প্রিয় ছিল, তা তাদের লেখার নমুনা দেখতেই বুঝা যায়। মিশরীয়রা তখন শিখতেন স্টাইলস জাতীয় লোহার কলম দিয়ে।

স্টাইলসের বদলে ক্রমে ক্রমে খাগের কলম এবং কাঠ, পাথর, বাঁশের জায়গায় স্থান করে নিল প্যাপিরাস। হায়ারোগ্লিফিক লেখায় হাজার হাজার বছরের আড়ষ্টতা দূর হলো। দ্রুত লিখতে লিখতে সহজ সরল এবং টানা টানা গোটা গোটা লেখার প্রচলন হলো। নতুন এ লিপির নাম হায়ারেটিক লিপি। খ্রীষ্টপূর্ব সারে তিন হাজার বছর পূর্বে হায়ারেটিক লিপিতে লেখা কতকগুলো প্যাপিরাস পাওয়া গেছে। ‘দি বুক অব দি ডেড’ এই লিপিতেই তৈরি হয়েছিল।

ব্যবহারিক জীবনে আরও সহজ সরল লিপির প্রয়োজন দেখা দিল। চালু হলো আরও এক প্রকার লিপি। এ লিপি হায়ারেটিক লিপির চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল। এ লিপির নাম ডেমোটিক লিপি। গ্রিক শব্দ DEMOS থেকে এসেছে ডেমোটিক শব্দটি। ডেমোস শব্দের অর্থ হচ্ছে জন সাধারণ।

অর্থাৎ ডেমোটিক লিপি ছিল ছেলে বুড়ো সকলের। এ লিপি সব কাজে, ব্যবসায় বানিজ্যে, শিক্ষা দীক্ষায় এবং সরকারি নথি পত্রে সর্বত্র ব্যবহৃত হতে লাগলো।

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৭-১৮২১) বিশ্বজয়ের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মিসরেও তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেন (১৭৯৮)। বলা বাহুল্য অন্যান্য স্বার্থপর ও উচ্চাভিলাষী সমর নায়কদের মতো তার পরিকল্পনাও পর্যুদস্ত হয়। তবে এ অভিযানে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভালো কাজ হয়েছিল। আর তা হলো রসেটা স্টোন ROSETTA STONE আবিষ্কার।

পাথরখানিতে ছিল তিন প্রকারের লিপি দিয়ে লেখা রাজার ঘোষণাপত্র— একেবারে উপরে ছিল হারারোগ্লিফিক, মাঝে ডেমোটিক এবং একেবারে শেষে ছিল গ্রিক। এই লেখা খোদাই করা হয়েছিল ফারাও পঞ্চম টলেমি এলিফানিশ (PTOLAMY EPEPHANES) এর সময় খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬ সালে। তার স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত রানী ক্লিওপেট্রা। পাথরখানিতে ওদের দু'জনেরই নাম ছিল।

ইংরেজ পণ্ডিত থমাস ইয়ং (Thomas Young, ১৭৭৩ থেকে ১৮২৯ সাল) তিনি ছিয়াশিটি ডেমোটিক শব্দের গ্রিক অনুবাদ করে একটি অভিধান তৈরি করেন।

জাঁ ফ্রাসোস শাপোলিয়ন (Jean Francois Champollion ১৭৯০-১৮৩২) তিনি রসেটা পাথরের রহস্য উদ্ধার করেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানতেন। এছাড়াও সম্রাট নেপোলিয়নের সময় রসেটা স্টোন বা রসেটা পাথর আবিষ্কারও লিপি গবেষণা কাজ ইত্যাদি মুহসীনের সময়ই হয়। মুহসীন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে অনেক দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ পড়েন। মিশরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখেন। এতে তাকে বেশ কয়েক বছর মিশরে অবস্থান করতে হয়।

মুহসীন বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের পর অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কা শরীফে যান হজব্রত পালন করার জন্যে। তিনি পবিত্র হজব্রত

পালন ছাড়াও— পবিত্র মক্কা, মদিনা, আরাফাত ময়দান, হেরা গুহা, মীনা, মুদালেফা, রসুলুল্লাহ (দঃ)র রওজা মোবারক সহ অন্যান্য পবিত্র স্থান সমূহ দর্শন করেন। সেসব নিয়ে গবেষণা করেন।

এছাড়াও তিনি ওখানকার বুজুর্গানে দ্বীনদের সংস্পর্শ লাভে ধর্ম বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন। এমনিভাবে বিদেশ বিভূঁইয়ে তার ২৭ টি বছর একে একে কেটে যায়। দেশের মায়ায় আবার তিনি দেশে ফেরার জন্যে উতলা হয়ে পড়েন।

তিনি যখন দেশে ফেরেন তখন তার বয়স ৫৭ বছরে পৌছে। তার কোনো চাকরি বাকরি নেই। কোনো ব্যবসা বানিজ্য নেই। অথচ দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে দয়ালু ও গরীবের বন্ধু মুহসীন ফিরে এসেছেন। ইমাম বাড়ার সামনে ভিড় জমে যায়।

মুহসীন এইসব গরীব দুঃখীর মাঝে আসতে পেরে খুশি হন। কিন্তু সেই সঙ্গে মনটা ব্যথিতও হয়ে ওঠে। তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েন, ওদেরকে তিনি কীভাবে সাহায্য করবেন।

মুহসীন গভীরভাবে ভাবেন। পথ খুঁজে পান। সে পথটি হলো তিনি কোরান শরীফ ও হাদিস দেখে দেখে লিখবেন। সেসব বিক্রি করে যে টাকা আসবে তা তিনি গরীব দুঃখীদের মাঝে বিলি করে দেবেন। আগে তিনি যখন নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজ দরবারে চাকরি করতেন তখন যা বেতন পেতেন, নিজের জন্যে সামান্য রেখে বাকি সব গরীব দুঃখীদের দিয়ে দিতেন। এখন তিনি সেরকম ব্যবস্থাই করবেন। মুহসীন কোরান হাদিস ও ফারসি কেতাব দেখে দেখে লেখা শুরু করে দিলেন।

গরীব দুঃখীদের বিপদে আপদে ও বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা মুহসীনের কিশোর বয়স থেকেই শুরু। মুহসীনের যখন ১৪/১৫ বছর বয়স তখন মুহসীন নিজের জামা খুলে গরীবকে দিয়ে দিতেন। খেতে বসেছেন তখন কোনো ভিখারী এলে তিনি তার খাবার ভিখারীকে দিয়ে দিতেন। ফতুয়ার পকেটে কোনো টাকা পয়সা থাকলে তা দরিদ্রজনকে না দেয়া পর্যন্ত তিনি যেন শান্তি পেতেন না। কাজেই দান খয়রাত মুহসীনের সহজাত। আর এই দান খয়রাতের বিনিময়ে তিনি তার নামডাক হোক,

লোকে তাকে দাতা হাতেম তাই বলুক, লোকে তাকে দয়ালু মুহসীন বলুক এসব চাইতেন না। দান করে তিনি অহংকারও বোধ করতেন না। তার একটাই আশা, দান খয়রাত করলে আল্লাহপাক খুশি হবেন— আখেরাতে আল্লাহপাক এর বিনিময়ে তাকে অনেক অনেক পুরস্কার দেবেন সে সব পুরস্কার তার তখন অনেক বড় কাজে লাগবে।

কিন্তু মুহসীন না চাইলেও, লোকে তাকে দানবীর, দয়ালু, মহাপ্রাণ বলতে শুরু করে। মুহসীন বেঁচে থাকাকালেই সব মানুষ তাকে দয়ালু মুহসীন বলে ডাকতে থাকে। এটাও ছড়িয়ে যায়— মুহসীনের কাছে গেলে কেউ খালি হাতে ফিরবে না।

মুহসীন নামের সাথে তার কাজের ধারার হুবহু মিল পড়ে যায়। কেননা, মুহসীন শব্দের আভিধানিক অর্থ উপকারী বা দয়ালু। মুহসীন সুশিক্ষিত ছিলেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজ বাড়ী ইমাম বাড়িতে। শিক্ষক বাড়ী এসে মুহসীনকে লেখাপড়া শেখাতেন। ১৫/১৬ বছর বয়সে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে যান। সেখানে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও সংগীত বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন এবং অল্প দিনেই পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মুহসীনের জ্ঞানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয় সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে।

মুহসীন বিস্ত্রশালী ও বনেদী পরিবারের সন্তান। জন্মের পর থেকেই তিনি ধন সম্পদ দেখেছেন। কিন্তু ধনসম্পদের মোহে তার মন ও মানসিকতা কখনও সংকীর্ণ হয়ে যায়নি। তিনি কৃপন হননি বা লোভী হয়ে ওঠেননি। ধন সম্পদ তাকে কখনও আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং তিনি শৈশব থেকেই অকাতরে দান খয়রাত করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

দান করায় মুহসীনের সম্পদ কমে যায়নি বরং বাড়তেই থাকে। আল্লাহ পাক বলেছেন যে, দান করলে তা ডবল হয়ে যায়। মুহসীনের বেলায় তাইই হয়। একে তো তিনি বিস্ত্রশালী এর মধ্যে তিনি আবার তার বোনের বিশাল ধনসম্পদের মালিক হয়ে যান।

মনুজ্ঞানের বাবা আপা মোতাহেরের মৃত্যুর পর হাজী ফয়জুল্লাহ তার বিধবা মাকে বিয়ে করেন। সে মায়ের গর্ভ থেকেই মুহসীনের জন্ম।

মনুজানের বাবা আগা মোতাহের বিশাল ধন সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি ছিলেন জমিদার। তার জমিদারী হুগলী, নদীয়া, ফরিদপুর ও যশোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃত্যুর আগে তিনি এই বিশাল সম্পত্তি মেয়েকে দিয়ে যান। মনুজানও বেঁচে ছিলেন আশি বছরের উপরে। মৃত্যুর আগে মনুজান তার বিশাল সম্পত্তি মুহসীনকে উইল করে দিয়ে যান। মুহসীন এসব ধন সম্পদ গরীব দুঃখী দরিদ্রজনদের খেদমতে অকাতরে ব্যয় করেন।

মুহসীন তার বোনের সম্পত্তি পেলেন কিভাবে সেটা জানা দরকার।

মনুজান তাদের হুগলীর বাড়ীতে থাকেন। হুগলী শহরে এটি একটি অপূর্ণপ কারুকার্যময় অট্টালিকা যা দেশবীদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সুদৃশ্য অট্টালিকার মালিক আগা মোতাহের সাহেব একজন ধনাঢ্য জমিদার। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। কয়েক বছর হলো তিনি মারা গেছেন। তার একমাত্র কন্যা বিবি মনুজান সেই বিশাল জমিদারী ও ধন-দৌলতের একমাত্র মালিক।

মনুজান নিজের ঘরে বসেছিলেন এমন সময় মুহসীন সেখানে এলেন। চেয়ারে বসেই মুহসীন বল্লেন—

‘মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারে একটা চাকরি পেয়েছিলাম। কিন্তু পোশালো না— তাই চলে এলাম।’

মনুজান খুশি হয়ে বল্লেন—

‘চলে এসে ভালই করেছো। আমি ভীষণ মুশকিলে পড়েছি আর এর জন্যে অশান্তিতে দিন কাটছে আমার।’

মুহসীন উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলেন—

‘কেন, কিসের মুশকিল— কি এমন অসুবিধা ঘটলো বলো?’

মনুজান ইতস্তত করছেন। হাজার হলেও মেয়ে তো। নিজের বিয়ের কথা বাঙালী মেয়েরা নিজের মুখে প্রকাশ করতে লজ্জা পায়। মনুজানেরও সে অবস্থা হলো। তিনি দ্বিধা করছেন দেখে মুহসীন তাকে বলবার জন্য তাগাদা দিলেন।

লাজ শরম ঝেড়ে ফেলে মনে সাহস সঞ্চার করে মনুজান অবশেষে মনের কথা প্রকাশ করলেন, বললেন—

‘তুমি তো জানো বিশাল জমিদারীর মালিক আমি। বিপুল ধনসম্পদ আমার এখন। সেই জমিদারী ও ধন দৌলতের লোভে আজ বহুলোক আমাকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসছে। কাকে রেখে কাকে কথা দিই বুঝে উঠতে পারছি না।’

মুহসীনও চিন্তিত হলেন, বললেন—

‘—দুর্ভিক্ষার কারণই এটা।’

মনুজান অসহায়ের মতো মুহসীনের একখানা হাত ধরে বললেন—
আমরা পরস্পরে সৎ ভাই বোন হলেও আপন ভাইবোনের মতো এ পর্যন্ত বসবাস করছি। আমাদের আর কোনো মুরব্বী নেই। তুমি বিদ্বান, বিচক্ষণ— একমাত্র ভাই, আমার একান্ত আপন জন, তুমি আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর।’

মুহসীন আদরের বোনকে আশ্বস্ত করে জিজ্ঞেস করলেন—

‘তুমি কি বিয়ে করবে নাকি আইবুড়ো থাকবে?’

মনুজান মাথা নিচু করে স্পষ্ট জবাব দিলেন—

‘না ভাই, নারী হয়ে যখন জন্ম নিয়েছি— বিয়ে আমাকে করতেই হবে। তাই বিয়ে আমি করবো।’

ক্ষানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনুজান আবার বললেন—

‘আমার পিতা মরহুম আগা মোতাহের একজন ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন। তুমি তাকে দেখোনি। আমার যখন বুদ্ধি সুদ্ধি হয়েছে তখন তিনি মারা যান। আশ্চর্য সঙ্গে তার কোনোদিনই সন্তান ছিলো না। আশ্চর্য যখন অসুখ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আর তিনি বাঁচবেন না। একদিন হাত ইশারায় কাছে ডেকে নিয়ে আমার গলায় একটি মাদুলি পরিয়ে দেন। অতিকষ্টে বলেন—এটা যত্ন করে রাখবে— সাবধান যেন না হারায়। আশ্চর্য মৃত্যুর পর একদিন মাদুলীটা খুললাম, দেখা গেলো তিনি তার সব সম্পত্তি আমাকে দান করে গেছেন।’

মুহসীন বললেন—

‘আমাকে কিছুই দেননি সে আমি জানতাম।’

মনুজান সঙ্গে সঙ্গে বললেন—

‘সেই রাগে দুঃখে অভিমানেই তো আত্মা আবার বিয়ে করেন। তিনি যদি বিধবা হয়ে আমাকে নিয়েই থাকতেন, তাহলে তোমার মতো ভাই আমি কোথায় পেতাম।’

মুহসীন—

‘সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।’

মনুজান বললেন—

‘হ্যাঁ ভাই সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা। তার বিনা ইশারায় গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ে না। আমার বিয়ের ব্যাপারে আবার ইচ্ছার কথা একবার শুনেছিলাম।’

মুহসীন উৎসুক হয়ে বললেন—

‘তাই নাকি— কি সে ইচ্ছা— বরই বা কে— তুমি নাম ধাম জানো?’

মনুজান সহজকণ্ঠেই বললেন—

‘আবার খুবই ইচ্ছা ছিল তার ভাগ্নে মির্জা সালাউদ্দিনের সাথে আমার বিয়ে হয়।’

মুহসীন চিন্তায় পড়লেন, বললেন—

‘তোমার জান্নাতবাসী আবার ইচ্ছাকে পূরণে আমি আশ্রাণ চেষ্টা করবো। কিন্তু, সালাহউদ্দিন কে, কোথায় থাকেন কিছুই তো জানি না,— কোথায় কিভাবে তার খোঁজ করবো।’

মনুজান যেন উৎসাহী হয়ে ওঠলেন, বললেন—

‘আমি জানি মির্জা সালাহ উদ্দিন এখন কোথায় আছেন—কি করেন।’

মুহসীন উদযীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—

‘কোথায় আছেন— কি করেন, আমাকে বলো।’

মনুজান—

‘মির্জা সালাহউদ্দিন এখন মুর্শিদাবাদে আছেন। তিনি নবাব আলীবর্দী খাঁর সিপাহসালার।’

মুহসীন অবাক হলেন। বললেন—

‘বলো কি। মির্জা সালাহউদ্দিনকে তো আমি দেখেছি। আমি যখন দরবারে চাকরি করতাম তখন তাকে মাঝে মাঝেই দেখতাম। উচা-লম্বা

সুঠামদেহ, শুশ্রী চেহারা। হ্যাঁ দু'জনে মানাবে ভালো। তোর সঙ্গে কি জানাশোনা আছে?' মনুজান লজ্জায় মাথানত করলেন, মৃদুস্বরে বললেন— 'দু'একবার সাক্ষাত হয়েছিল। তবে তিনি তার পরলোকগত মামার ইচ্ছা জানেন— তাই আজও বিয়ে করেননি। সাহস করে মুখ ফুটে আমাকে কোনোদিন বলেনও নি। একবার তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেনও— মামার কবর জিয়ারত করেছেন, ঘুরে ঘুরে বাড়িঘর দেখেছেন। তবুও মুখ ফুটে আমাকে কিছু বলেননি। শুধু এটুকুই বলেছেন —

‘এতো বিশাল সম্পত্তি, এতো ধনদৌলত কোনো অসুবিধা হলে জানাবেন।’

মুহসীন খুশি হলেন, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—

‘আমি দু’ একদিনের মধ্যেই প্রস্তাব নিয়ে সালাউদ্দিনের বাড়ি যাবো। তোমার আবার ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করবো।’

পরদিনই মুহসীন বোনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মুর্শিদাবাদ দরবারে যান। সেখানকার সবাই মোটামুটি মুহসীনের পরিচিত। তাই সিপাহসালার সালাউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ বা তার সাথে সাক্ষাতের সময় করা কঠিন হলো না।

মির্জা সালাহউদ্দিন মুহসীনের কথা আগেই অনেক শুনেছেন। তাছাড়া তিনি জানতেনও মুহসীন মনুজানের ভাই। খুব সমাদর করে বসালেন। খাওয়া দাওয়া করালেন। তারপর দু'জনে আলাপ আলোচনায় বসলেন।

মুহসীন জানালেন বোনের বিয়ের প্রস্তাব। মির্জা সালাহউদ্দিন খুব খুশি হলেন। এতদিন পর তার মনের আশা পূরণ হতে চলেছে মনে করে তার হৃদয় মন আনন্দে ভরে গেলো। তিনি বিনীতভাবে মুহসীনকে বললেন—

‘ভাইজান, এ বিয়ে তো মরহুম মামাজান তার জীবিতকালে স্থির করেছিলেন। হঠাৎ তার মৃত্যু হওয়াতে বিষয়টা আর এগোয়নি। কিন্তু আমি সদা সর্বদা খোঁজ রাখতাম। কারণ আমি মামাজানের আশাপূরণে সর্বদাই আকুল ও অগ্রহী ছিলাম। রাজ দরবারের কাজের চাপে ওদিকে মনুজানের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। আপনি এসেছেন—শুভকাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলাই ভালো।’

মুহসীন তাকে সম্মতি জানিয়ে বললেন—

‘হ্যাঁ, শুভ কাজ ভাড়াতাড়ি সম্পন্ন হওয়াই ভালো। কেননা, আমি বিদেশ সফরে বের হবো। কবে ফিরে আসি তার ঠিক নেই— আদৌ ফিরে আসা হয় কিনা, জানি না। তাই, আমি দেশের বাইরে যাওয়ার আগেই বিয়ের কাজটা শেষ করে যেতে চাই।’

মনুজান ও মির্জা সালাউদ্দিনের বিয়ে ধুমধামের সাথে সম্পন্ন হয়। হুগলী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুর্শিদাবাদের রাজ দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে মুহসীন বিদেশ ভ্রমণে বের হন।

বিদেশ ভ্রমণের সময় মুহসীনের ভাবান্তর—

‘পথ আমায় ডেকেছে। ঘরের কোণে বন্দী হয়ে কেমন করে থাকতে পারি। বোন মনুজানের বিয়ে দিয়ে এবারে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছি। আর কোনো বন্ধন নেই। কোনো পিছুটান নেই। পথের ডাকে চলেছি দেশ থেকে দেশান্তরে। আজ আমার বার বার মনে পড়ছে ওস্তাদ সিরাজী সাহেবের কথা। তিনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক। দেশ ভ্রমণের চিন্তাকর্ষক গল্প কাহিনী শুনিয়ে তিনি আমার শিশু কিশোর মনে ভ্রমণের আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাই আজ আমি পদব্রজে আরব, পারস্য (বর্তমান ইরান), তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। পথ ঘাটের নানান বাধা বিঘ্ন আমার অদম্য ইচ্ছাকে দমন করতে পারছে না। মন আমার উদ্দাম, উদ্ভাল।’

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, প্রান্তর, জনপদ, পাহাড় পর্বত, ভ্রমণে কতো অজানা জ্ঞানলেন মুহসীন, কতো অচেনারে চিনলেন, মনের মতো প্রশ্নের উত্তর যে পেলেন মুহসীন হিসাব দিতে পারবেন না। এক এক দেশের এক এক রীতি, এক এক দেশের এক এক আচার অনুষ্ঠান। কত বিচিত্র স্বভাবের মানব চরিত্র মুহসীন যতো ভাবেন ততই বিস্মিত হয়ে ওঠেন।

তবে, মুহসীন লক্ষ্য করলেন বিশ্বের সব মানুষেরই একটি স্থানে মিল সেটি হলো মৃত্যু। ধনী-গরীব, সাদা-কালো, লম্বা-খাটো সব নারী-পুরুষকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। স্থান করে দিতে হবে

নতুনেরে। বহুকাল, বহুযুগ ধরে বিশ্বে এই নিয়ম চলছে। পুরনোর স্থানে নতুন আসছে।

মুহসীনের এখানেই দুঃখ যে, মৃত্যু অনিবার্য জেনেও মানুষ অনবরত ছুটছে ধন দৌলতের জন্যে, ছুটছে মান মর্যাদা প্রতিপত্তির জন্যেও; ধর্মের রস নেবার জন্যে খুব কম লোকই মেহনত করছে। অথচ এটাই বেশি দরকার।

মুহসীন মনে করেন— এ পৃথিবী হচ্ছে আবাদ করার স্থান। অর্থাৎ ধর্মের যত কাজকর্ম আছে তা করার স্থান। জাগতিক বিষয়ের চেয়ে পারলৌকিক ব্যাপারে বেশি সময় ব্যয় করা দরকার; বেশি বেশি উৎসাহ প্রকাশ করা প্রয়োজন। মুহসীনের দুঃখ এখানেই— বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে দেখলেন, মানুষ শুধু জাগতিক ফললাভের জন্যেই পাগলপারা হয়ে ছুটছে। এতে তাদের পরিণামের কথা ভেবে মুহসীনের আফসোস হয়— দুঃখ হয়। মুহসীন সর্বদা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন আল্লাহ পাকের দীদার লাভের, কিন্তু এখনও তিনি তার সাধনায় সফল হতে পারেননি। তিনি আফসোস করে একাকী গুন-গুন করে গান—

জীবন ভরে

মরনু ঘুরে

পথে পথে

তোমায় তবু

পেলাম নাকো

কোনো মতে।

অকাজে মোর কাল অপচয়

তোমার ডাকার হয় না সময়

অ-দিনে আজ

এসো দয়াল

মনোরনে॥

যে দেশেই মুহসীন পৌছেছেন, নিজে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেছেন, সেই সঙ্গে মানুষকেও ইহকাল পরকালের করণীয় কাজ সম্পর্কে বুঝাতে

চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজে আহরণ করেছেন-অন্যকেও দান করেছেন। এমনিভাবে বিদেশের ঘরে-বাইরে, পথে-প্রান্তরে, বন্দরে-গঞ্জে তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর কাটালেন।

এবারে মুহসীনের ফেরার পালা। মন দেশের জন্যে উনুখ হয়ে ওঠে। হুগলীর ঐ নদী- নদীর ঢেউ খেলানো পানির কুলু কুলু শব্দ। পাখির কিচির মিচির শব্দ, গাছের সুশীতল ছায়া, হাটবাজারের কোলাহল এবং গরীব-দুঃখীদের বেদনা ক্লিষ্ট মুখ মুহসীনকে কেবল হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। মুহসীনের মন উতলা হয়ে ওঠলো। কোনো কিছুতেই আর মুহসীনের মন বসে না।

মুহসীন স্থির করলেন তিনি দেশে ফিরে যাবেন। যখন তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তিনি মিশর সফর করে মক্কা মদিনায় হজ্জ সমাপন করেছেন। তেমন কিছু আর বাকি রইলো না ভেবে মুহসীন একদিন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে জাহাজে ওঠে বসলেন।

মুহসীনের দেশে ফেরার আরো কারণ তিনি যখন মোরাদাবাদের দিকে রওনা দেবেন তখন তার হাতে একটি চিঠি পড়ে। খুলে দেখেন চিঠিটা এসেছে ভারতবর্ষ থেকে, লিখেছেন বোন মনুজান। খুশি কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে তিনি ততক্ষণাৎ চিঠিটা পড়ে ফেলেন। চিঠিটাতে বেশি কিছু লেখা ছিল না- মনুজান ভালো আছেন, শিঘ্র দেশে ফিরলে ভালো হয়।

এই সংক্ষিপ্ত চিঠির ব্যাপারে মুহসীন অনেক কিছুই আকাশ পাতাল ভেবেছেন। যদিও বোন লিখেছে সে ভালো আছে- মুহসীনের দুশ্চিন্তা আসলে বোন ভালো নেই। যেকোন দিক থেকে তার অসুবিধা হচ্ছে- নাহলে সে তাকে দেশে ফিরতে বলবে কেন। মুহসীন জানেন, বোনের বিশাল সম্পত্তি- এসব নিয়ে বুট ঝামেলা হওয়া মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। এ রকম হাজারো চিন্তা-ভাবনা মুহসীনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

মুহসীন তাই দেশে ফেরারই সিদ্ধান্ত নেন এবং জাহাজ যোগে বোম্বাই শহরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে তিনি নিজের শহর হুগলীতে ফেরেন।

মুহসীন বাড়ী ফিরে দু'দিন কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। শান্তি

ক্লান্তিতে তিনি এতটাই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, বিশ্রাম নেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।

তৃতীয় দিন রাতে মনুজান ঘরে প্রবেশ করেন। মনুজানকে দেখে মুহসীন চমকে ওঠলেন। মুহসীন দেখলেন বোনের শুকনো মুখ। চুলগুলো অপরিপাটি। গায়ে কোনো গহনা নেই। পরনে সাদা কাপড়। মুহসীন কিছু বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে যান। স্তব্ধ বিশ্বয়ে বোনের মুখপানে তাকিয়ে থাকেন।

মনুজান একটি চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে বললেন—

‘ভাই, আমি দিন রাত আল্লাহতালার কাছে তোমার ফিরে আসার জন্যে দোয়া করেছি।’

মুহসীন—

‘ভেবেছিলাম, আমি আর ফিরবো না। দীর্ঘ সাতাশ বছর আমার প্রবাসে কেটেছে। আমি যখন মোরাদাবাদের দিকে রওনা দেই তখন তোমার চিঠি পাই। বোনের চিঠি পেয়েছি—আর কি আমি না এসে থাকতে পারি। এই হুগলী— এ আমার জন্মভূমি— জননী। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ওর বুকে আজ ফিরে এসেছি।’

মনুজান গাঢ়স্বরে বললেন—

‘জানো ভাই তুমি এখান থেকে চলে যাবার কয়েক বছর পরই আমার স্বামী মির্জা সালাহউদ্দিন জান্নাতবাসী হয়েছেন।’

মুহসীন দুঃখভরা হৃদয়ে বললেন—

‘সালাহউদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ জানতে না পেরে এতোদিন নিশ্চিত ছিলাম। তার যে অকালে মৃত্যু ঘটবে— এটা ধারণা করিনি। কিন্তু তোমার শুকনো মুখ, গহনাহীন নিরাভরণ দেহ এবং পরনে সাদা কাপড় দেখে আমার মনে খটকা লেগেছিল। তুমি তা দূর করে দিলে— আমি আন্তরিকভাবে খুবই দুঃখিত।’

মনুজান মনের দুঃখকে যথাসম্ভব চেপে রেখে ধীরকণ্ঠে বললেন—

‘স্বামীর মৃত্যুর পর আমি হয়ে যাই একা। বিশাল জমিদারী ও ধন সম্পদ আমার বুকের উপর জগদল পাথর হয়ে চেপে বসেছে। এই

অর্বস্পদ এখন আমার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্যে কপট বন্ধু আর গোপন শত্রুর অভাব আমার নেই। দুশমনদের জন্যে মহামহিম আল্লাহকে একটি দিনের জন্যে প্রাণভরে ডাকতে পারিনি। তুমি আজ ফিরে এসেছ— অসীম করুণা সেই দয়াময়ের।’

মুহসীন বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

‘সবই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বোন, সবই তার ইচ্ছা। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি, আমি এখানে না থাকায় তোমাকে একা একা অনেক ঝড়-ঝাপটা বোধ হয় সহিতে হয়েছে, না?’

মনুজান তার অসহায়ত্বের কিছুটা বর্ণনা দিয়ে বললেন—

‘সে দুঃখের কথা আর তোমাকে কি বলবো ভাই। বিধবা হয়ে একটি দিনও নিশ্চিন্তে থাকতে পারিনি। এই ধন সম্পদের লোভে দীন মজুর থেকে গুরু করে হুগলীর নবাব খাঁ জাহান খান পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কাকে যে কি জবাব দেই, ভেবে পাই না। আমি একা, তায় স্ত্রীলোক। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। শেষ পর্যন্ত সবাইকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস করতে গুরু করলাম।’

মুহসীন অবাক হয়ে—

‘সবাইকে অবিশ্বাস?’

মনুজান বললেন—

‘হ্যাঁ ভাই, সবাইকে। তার কারণও ঘটেছিলো। হুগলীর নবাবের প্রস্তাবকে যখন ফিরিয়ে দিলাম, তারপর থেকে দু’একজন বাঁদীর আচরণ আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হতে লাগলো। তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগলাম। একদিন সন্দেহ হলো, হয়তো খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে আমাকে খেতে দিয়েছে। সন্দেহ দূর করার জন্যে একটা বিড়ালকে সেই খাবার আগে খেতে দিলাম! যা আশংকা করেছিলাম, ঠিক তাই— বিড়ালটা পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই মারা গেলো।’

মুহসীন অবাক বিস্মিত হয়ে বললেন—

‘কী ভয়ানক ব্যাপার! বিড়ালটা মরে গেল!’

মনুজান—

‘হ্যাঁ ভাই— বিড়ালটা ছটফট করে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।’

মুহসীন জানতে চাইলেন—

‘ভাগ্যিস তুমি খাবার খাওনি। সেই বাঁদীকে শাস্তি দিলে না?’

মনুজান—

‘দিয়েছি। দাসী, বাঁদী, চাকর, নফর যতো ছিলো, সবাইকে এক মাসের টাকা আগাম দিয়ে বিদেয় করেছি।’

মুহসীন—

‘বেশ করেছে।’

মনুজান এবারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—

‘এতোদিন তোমার প্রতীক্ষা কেনো করেছি জানো ভাই— দিন আমার শেষ হয়ে এসেছে। এবারে এই বিষয়- সম্পত্তির ভার তোমার হাতে দিতে চাই। আর তার সঙ্গে দিতে চাই একটা পরমা সুন্দরী বউ, কেমন?’

মুহসীন স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলেন—

‘গাছের ছায়ায়, পথে প্রান্তরে, মাঠে ময়দানে যার জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে, তার কাঁধে আর সংসারের জোয়াল জুড়ে দেয়া কেন বোন?’

মনুজান আবদারের সুরে বললেন—

‘আমার কি সাধ হয় না ভাইয়ের বউয়ের মুখ দেখার?’

মুহসীন হাত জোড় করে বললেন—

‘মাফ করো বোন। আমার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র দেশবাসী আধপেটা খেয়ে যেখানে দিন কাটাচ্ছে। বিয়ে করে তাদের সেবা হতে আমাকে বঞ্চিত হবার অনুরোধ করো না বোন। তবে তোমার অনুরোধে— তোমার বিষয় সম্পত্তির ভার আমি নিতে পারি কিন্তু বিয়ে করতে আমি পারবো না।’

মনুজান বেজাড়া হলেন না বরং বললেন—

‘বেশ তাই হোক। বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিলপত্র আগে থেকেই আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, শুধু সাবরেজিস্ট্রারের আপিসে তোমাকে একটু কষ্ট করে যেতে হবে।’

মুহসীন বললেন—

‘মনে কিছু করো না বোন, আমি তোমার অযোগ্য ভাই। বিয়ে করে তোমার সাধ পূরণ করতে পারলাম না।’

মনুজান বল্লেন—

‘আমি ভুল করেছিলাম ভাই। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি জাগতিক দিক থেকে এখনও কিছু ভাবনা চিন্তা করো। তাই তোমাকে বিয়ে করার কথা বলেছিলাম। আমার সে ভুল ভাঙলো। যাক্ অনেকদিন তোমার গলার গান শুনিনি—আজ একটি গান শোনাও—’

মুহসীন বোনের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না, গাইলেন—

মায়া মিছে—

আমার আমি যে চলিয়া যাইব

সকলি রহিবে পিছে।

ধন-দৌলত বন্ধুস্বজন সকলি রহিবে ভবে

কিছু না সঙ্গে যাবে গো— কেহ না সঙ্গী হবে,

খালি হাতে আমি একা একা হায়

চলিয়া যাইব নিজে॥

পরদিন ভাইবোনে রেজিস্ট্রি অফিসে যান। বোন মনুজান তার নামের দানের উত্তরাধিকারের সকল সম্পত্তি ভাই হাজী মুহম্মদ মুহসীনের নামে দলিল করে দেন। সেই সঙ্গে মনুজান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এই ভেবে যে, এখন থেকে তিনি স্বস্তি ও শান্তির জীবন যাপন করতে পারবেন।

অন্যদিকে হাজী মুহম্মদ মুহসীন এখন আরো বিস্তবান, ধন সম্পদের মালিক এখন তিনি আরও মন খুলে সমাজ সেবা করতে পারবেন—করেছেনও।

হাজী মুহম্মদ মুহসীনকে জানতে হলে সমাজ কি, সমাজ কাকে বলে এবং দানশীলতা কি এসব জানতে হবে। সেই সঙ্গে আগেকার দিনে সমাজ সেবা ও এখনকার দিনে সমাজসেবা বা সমাজকল্যাণ কি সে সম্পর্কেও জানা দরকার।

মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। তবে কীভাবে, কবে সমাজের

উৎপত্তি হয়েছে তা সঠিক বলা যায় না। অবশ্য একথা নিশ্চিত যে, মানুষ কখনও একাকী বাস করেনি। সঙ্গপ্রিয়তা, জীবিকার সংস্থান ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষ আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। অর্থাৎ, সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ যখন তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য একতাবদ্ধ হয় তখনই সমাজ জীবনের সূত্রপাত ঘটে। আদিকালে পরিবার ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে সহজ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মানুষের উন্নততর চিন্তা, সাংগঠনিক তৎপরতা ও বিভিন্নমুখী তাগিদে এ সমাজ বৃহত্তর রূপ ধারণ করেছে।

একজনকে নিয়ে সমাজ হয় না। সমাজের মানুষের সংখ্যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখাও নেই। তবে সংখ্যা যাই হোক না কেন—

‘সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতেই হবে এবং তারা তাদের এ পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন থাকবে।’

মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক বলতে কেবল রক্তের বা বংশগত কিংবা আত্মীয়তার বন্ধনকে বোঝায় না। এবং পারস্পরিক লেনদেন ও বোঝাপড়ার জন্য যে কোনো সম্পর্কেই ইঙ্গিত করে। যেমন— শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক, ছাত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্ক, মালিক শ্রমিক সম্পর্ক, এমনকি শত্রুর সাথে শত্রুর যে সম্পর্ক তা-ও। এ সম্পর্কের প্রকাশ ঘটে ভাবের আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে। ব্যবহারিক জীবনে নানা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে; অধিকার, কর্তব্য, শাসন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে। ফলে দেখা যায়—

“একই মানুষ নানাভাবে অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে। সমাজ হচ্ছে সেই সম্পর্কের জটাজাল।”

একা নিঃসঙ্গ জীবন মানুষের কাছে অসহ্য। সুখে-দুঃখে, আনন্দ উল্লাসে, আপদে- বিপদে মানুষ অন্যের সাহচর্য কামনা করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মানব জীবনে বহু কিছু প্রয়োজন হয়। এ সকল প্রয়োজনের প্রায় সবকটিই মানুষ অন্যের সাহায্য ছাড়া একা পূরণ করতে পারে না।

স্নেহ ভালবাসা, আবেশ-অনুভূতি, সমবেদনা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি, সামাজিক বন্ধন, ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা সমাজ

জীবনের মূল ভিত্তি।

সমাজে শুধু সহযোগিতা ও সহমর্মিতাই বিদ্যমান নয়, এসবের পাশাপাশি অবহেলা, ঘৃণা, ঘৃণা, কলহ, ঐক্য, অনৈক্য সবকিছুই বিদ্যমান।

ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and Page) এর ভাষায় বলা যায়— 'নিরাপত্তা, সুখ, শিক্ষার উপকরণ, সুযোগ, সমাজের দেয়া আরো বহু পরিচর্যার জন্য মানুষ সমাজের ওপর নির্ভরশীল। সে তার স্বপ্নের জন্য, আকাঙ্ক্ষার জন্য, এমন কি তার শারীরিক, মানসিক পীড়ার জন্য সমাজের ওপর নির্ভরশীল। সমাজে তার জন্মগ্রহণই সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রমাণ করে।'।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন—

'প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিশ আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষদ আমার রাস্তা কাঁট দেয়, ম্যাগেইসটার আমার কাপড় যোগায় এবং জ্ঞান লাভ প্রভৃতি বড় বড় উদ্দেশ্য ওই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ, সমাজস্থ সকলের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।'।

সমাজের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের পারস্পরিক অভাব ও প্রয়োজনবোধ থেকে। কাল এবং স্থানভেদে সমাজের বৈশিষ্ট্যগত তারতম্য লক্ষ্য করা গেলেও মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া সমাজ অকল্পনীয়। ব্যক্তিকে নির্মাণ করে সমাজ। নিদ্রায়, নির্জনে এবং এমন কি আত্মহননে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রন করে সমাজ। ব্যক্তি সমাজের পুতুল বা কয়েদি। কেননা, এর বিপরীতে রয়েছে সেই ভয়ঙ্কর এলাক— এ্যানোমি (Anomie) যেখানে কোনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ অথবা সংহতি ক্রিয়াশীল নয়।

সুতরাং সমাজের জন্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। যখনই সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অভাব ঘটে তখনই সমাজে নেমে আসে অশনি সংকেত। দেখা দেয় অভাব-অনটন, দুঃখ-দারিদ্র। অবশ্য, সমাজের এ বিপর্যয় একদিনে ঘটে না। দিনের পর দিন ব্যক্তি

স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে সমাজের স্বার্থে টানা পোড়েন শুরু হয়ে যায়।

সেটা যেন না হয়, সেজন্যে বিস্তবান, ধনবান, সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের এগিয়ে আসা উচিত। তারা এগুলোই সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

এবারে আসা যাক দানশীলতার কথায়।

দানশীলতার ইংরেজী Charity শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Charitas হতে উদ্ভূত যার অর্থ মানবপ্রেম।

সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য প্রদান করাকে দানশীলতা বলা হয়। দানশীলতা একটি ব্যাপক শব্দ। অর্থ সাহায্য, সম্পত্তি দান কিংবা কোনো জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করা দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত।

দানশীলতা ও ভিক্ষাদান এক নয়। ভিক্ষকের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে অতি সামান্য পরিমাণ অনু, বস্ত্র বা অর্থ সাহায্য হলো ভিক্ষাদান। এ দান করুণা মিশ্রিত হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু দানশীলতা বলতে সাধারণত বড় আকারের দান বোঝায়। কারো প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে হয় দাতা নিজেই মানবতাবোধে অনুপ্রানিত হয়ে দান করে থাকে। ভিক্ষা কেবল ব্যক্তিকে দেয়া হয় কিন্তু দান ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে প্রদান করা হয় শর্তহীনভাবে, স্বার্থভ্যাগ করে অপরের কল্যাণে।

ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত—

‘আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি মানুষ বিচারের দিন হিসাব- নিকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দানের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে।’

বিশ্বের সকল সমাজে ও সকল ধর্মেই দানশীলতা একটি পুণ্যের কাজ বলে স্বীকৃত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে—

“যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান সদকাহ করো, তবে তাও বেশ। আর যদি গোপনে দান খয়রাত করো এবং গরীব দুঃখীকে দান করো তাও তোমাদের জন্যে উত্তম পছন্দ। এই পছন্দ তোমাদের ওনাহকে দূরীভূত করবে।”

অন্যান্য সমাজের ন্যায় খ্রীষ্টান সমাজেও দানশীলতার ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। খ্রীষ্ট ধর্মের অনুপ্রেরনায় ইংল্যান্ড- আমেরিকার সমাজ

কল্যাণের ইতিহাসে দানশীলতা যা চ্যারিটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

দানশীলতা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। দানশীলতাকে সংগঠিত করার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ইংল্যান্ডে এবং পরে আমেরিকায় যে দান সংগঠন আন্দোলন (Charity organisation Movement) শুরু হয় তা পরবর্তীকালে পেশাদার সমাজকল্যাণের জন্ম দেয়।

হিন্দু ধর্মেও দান প্রথার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থ ভগবত গীতার দানশীলতাকে সর্বোত্তম কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থদান, অভয়দান, বিদ্যাদান এই তিনভাবে হিন্দুধর্মে দানকার্য পরিচালনা করা হয়।

সব ধর্মই আত্মের সেবা, দরিদ্রকে দান, গৃহহীনকে আশ্রয় দানের জন্যে অনুসারীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। তাই, ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সমাজকর্মের মূল্যবোধের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। সমাজকর্ম মূলত ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সমাজ জীবনে ধর্মকে অস্বীকার করা যায় না, মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই সমাজ টিকে আছে। ধর্ম সমাজ জীবনের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান।

ইসলামে মানুষের স্থান সর্বোচ্চ— আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, আশরাফ-আতরাফ ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। একই কাতারে নামাজ আদায় একই মসজিদে সমবেত হওয়া, ঈদের নামাজে সকলের সঙ্গে সকলের কোলাকুলি— সবই সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা ও মর্যাদা দেয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

খ্রীষ্টান ধর্মে মনে করা হয় যে—

‘মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে শান্তির পাশে যাত্রা সম্ভব। এ বিশ্ব হলো স্রষ্টার পিতৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।’

হিন্দু ধর্মেও জীবে দয়া, দান, সহানুভূতি, সেবা, সদাচার প্রভৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যা মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা ও মমত্ববোধ থেকে উৎসারিত।

বৌদ্ধধর্মে জাতি, গোত্র ও বর্ণ বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। আছে

শোষিত, বঞ্চিত ও পঙ্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত প্রাণীকুলের মুক্তির সঠিক নির্দেশনা, রয়েছে মানবতাবাদের বীজ নিহিত।

একজন মূল্যবান ব্যক্তি এবং মানুষ হিসেবে যেকোনো সমস্যাগ্রস্তকে গ্রহণ করাই হচ্ছে এই মূল্যবোধের মূল কথা। সমাজকর্মী মনে করেন সৃষ্টি জগতের সকল ব্যক্তিই সমানভাবে যোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ।

সে অনুসারে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, কালো ধলো, গ্রামীণ-শহরে, উচ্চ-নীচ হিসেবে নয় বরং একজন মানুষ হিসেবে তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে থাকেন।

স্বার্থপরতা ও দায়িত্বহীনতা সমাজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। বস্তৃত সমাজের মূল ভিত্তিই হলো পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগীতা। সে জন্য রবীন্দ্রনাথ সমাজ বলতে বুঝিয়েছেন—

‘দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে।’

সবই লিপিবদ্ধ আছে কিন্তু সমাজবদ্ধ ক’জন মানুষ যেসব মানে। যদি তারা মেনে চলতো তাহলে বিশেষ করে এদেশের মানব সমাজের অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াতো।

হাজী মুহম্মদ মুহসিন ব্যতিক্রম এক ব্যক্তিত্ব। যিনি সকল সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে সমাজ সেবা করে গেছেন, দান করে গেছেন। নিজের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

যুগে যুগে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মানুষ এবং সমাজদরদী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, অভাব-অনটন মোচনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

আমাদের দেশের অতীত সমাজকল্যাণের ইতিহাস এসব সমাজ দরদীর অবদানে সমুজ্জল ও সমৃদ্ধ।

বাংলায় আধুনিক সমাজকল্যাণের সূত্রপাতের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ কল্যাণের ইতিহাসমূলক সমাজ দরদী ব্যক্তিদের অবদানের ইতিহাস। দীর্ঘদিন ধরে এদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে এলেও তৎকালীন সামাজ্য হিতৈষী ব্যক্তিদের অবদানের সুফল সমাজ

আজও পর্যন্ত ভোগ করছে এবং পেশাদার -অপেশাদার সমাজকর্মীদের প্রেরণার উৎস হয়ে বিরাজ করছে।

অবিভক্ত ভারতের স্বৈচ্ছামূলক সমাজ কল্যাণের ইতিহাসে যে ক'জন মনীষী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন দানবীর হাজী মুহম্মদ মুহসীন তাদের অন্যতম।

তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম উল্লেখযোগ্য সমাজকল্যাণ কর্মী। তার দানশীলতা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে পরলোকগত কবি গোলাম মোস্তফা তাকে 'বঙ্গের হাতেম' বলে অভিহিত করেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন ধর্মানুরাগী, সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী। পরোপকার, আত্মত্যাগ এবং মানবকল্যাণ ছিল তার জীবনের লক্ষ্য।

সংবানের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিশাল ধন সম্পদ তার সমাজ কল্যাণমূলক কাজে বিরাট অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দেয়। বস্তুত এতে তিনি শিক্ষা বিস্তার ও গরীব দুঃখীদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার বিরাট সুযোগ পেয়ে যান।

অবিভক্ত বাংলার কিছু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বহু দরিদ্রলোক এতে উপকৃত হয়। সমাজ উন্নত হয়।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন পার্শ্ব জীবনের আরাম আয়েশ ও লোভ লালসার উর্ধে ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের অধীনে উচ্চ বেতনে চাকরি করতেন। কিন্তু প্রাপ্ত বেতন থেকে সামান্য অর্থ নিজের জন্যে রেখে অবশিষ্ট সবই গরীব দুঃখী অসহায়দের দান করে দিতেন। দানের ক্ষেত্রে তার কাছে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান যে কোনো অসহায় ও অভাব গ্রস্তের পাশে তিনি দাঁড়াতেন।

রাতে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে মুহসীন প্রকৃত ভিক্ষুক, ক্ষুধাতুর বিধবা এবং অসহায় এতিমদের দান করতেন। F.B. Bradley Birt লিখিত Eminent Bengales in nineteenth century বইতে বলা হয়েছে—

It is said that he was even want to disguise himself and wonder throuh the pooret narters of the town seeking out the furnished beggar, the starving widow and the helpless orphan; and relieving their distress.

মুহসীনের হাতের লেখা খুবই সুন্দর। তিনি কোরান শরীফ নকল করে যে টাকা-পয়সা রোজগার করতেন তা অভাবগ্রস্তদের দান করে দিতেন।

তখনকার সময়ে হাতে লেখা একখানা কোরান শরীফের হাদিয়া দেয়া হতো এক হাজার টাকা। মুহসীন এভাবে বাহাত্তর খানা কোরান শরীফ নকল করেন।

তার কাছে বর্ণ-গোত্র ধর্মের কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মনের দিক থেকে তিনি এতই উদার ছিলেন যে, চাকর বাকরদের সাথে একত্রে খেতে বসতেন।

মুহসীন ছিলেন দয়ার সাগর। তিনি বলতেন—

‘অনাথ আতুর গরীবকে যা দান খয়রাত করবেন, পরকালে তার ফল খোদা আপনাকে দেবেন।’ মুহসিন উপাচক হয়ে অসহায় ও দরিদ্রদের সাহায্য করতেন।

মানুষের সকল সুখের মূল হলো স্বাস্থ্য। গরীব-ধনী, কালো-সাদা, উচ্চ নীচ, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান যেকোনো গোত্রের বা যে কোনো সম্প্রদায়ের যেকোনো অবস্থানে হোক— স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তার যতো অশান্তি। আর যদি দেহ সুস্থ থাকে তাহলে সব কিছুই ভালো লাগে। এ বিশ্বের সব কিছুই সুন্দর লাগে। এজন্যেই বলা হয়-স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।

বাংলায় যেহেতু অভাব অনটন বেশি, দরিদ্রজনের সংখ্যা বেশি-এজন্যে রোগীর সংখ্যা অধিক। রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই দরিদ্রজন।

বাংলায় তখন বিশেষ করে কয়েকটি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিতো। রোগগুলো হচ্ছে— ম্যালেরিয়া, প্লেগ, যক্ষ্মা, কলেরা ও বসন্ত।

ম্যালেরিয়া রোগটি মশার মাধ্যমে হয়ে থাকে। ঝোপ- নর্দমা, ডোবা-নালা ইত্যাদিতে মশককূল বংশ বিস্তার করে থাকে। বাংলার কলিকাতা, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর এবং পূর্ববঙ্গের প্রকৃতির রূপই হলো জঙ্গল, খাল-বিল, ডোবা-নালা, নদী ইত্যাদি। এজন্যে মশার উৎপাত বেশি।

বাংলার শতকরা ৮০ জন দরিদ্র বলে আর শাসকশ্রেণী রাস্তাঘাট, খালবিল ও নদীনালায় প্রতি জরুরী ভিত্তিতে নজর না দেয়ায় মশককূল নিরাপদে বংশবিস্তার করে ফলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, ম্যালেরিয়া রোগে দরিদ্রজনই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। তখন এ রোগের কোনো অমুখ ছিল না বল্লেই চলে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বহুলোক বাংলায় মারা গেছে।

প্লেগ রোগ ইঁদুর থেকে সংক্রামিত ও উৎপত্তি হয়ে থাকে। বাংলায় ইঁদুরের সংখ্যা প্রচুর ছিল। ইঁদুর শুধু এ রোগই ছড়াতো না ক্ষেতের শস্যাদি খেয়ে সাবার করতো। এই প্লেগ রোগেও বাংলায় বহু লোক মারা গেছে। আর মৃতদের মধ্যে দরিদ্রজনের সংখ্যা প্রায় সব।

যক্ষা রোগটি সম্পর্কে প্রবাদ আছে—‘যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা।’ অর্থাৎ যার একবার যক্ষা রোগ হয়— তার আর বাঁচার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এটাকে ক্ষয়রোগও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথমে ফুসফুসে এক প্রকার ক্ষত হয়। সেই ক্ষত ক্রমান্বয়ে সারা ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে ফুসফুসকে পচিয়ে ফেলে। তখন রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

সাধারণত যারা ধূমপান করে, খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট করে— ডিম, দুধ, মাছ, মাংস প্রতিনিয়ত ও নিয়মিত খেতে পারে না—তারাই যক্ষায় আক্রান্ত হয় বেশি।

বাংলার গরীব দুঃখী মানুষেরা নিয়মিত ভালো ও পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না। উপরন্তু তারা হকা, বিড়ি, সূতি, চুরট, গাঁজা, আফিম, ভাং ইত্যাদি খাওয়ায় অভ্যস্ত তাই এ রোগে দরিদ্ররাই আক্রান্ত হয় বেশি। এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলার বহু ঘরেই ন্যূনপক্ষে একজন যক্ষারোগী দেখা যেতো। যেহেতু ক্ষয়রোগ সেহেতু এ রোগে হঠাৎ মৃত্যু হয় না।

রোগী ধুকে ধুকে মরে। এ রোগে আক্রান্ত হলে ছয়মাস থেকে এক বছর রোগী বেঁচে থাকে। কিন্তু সে কোনো কাজ করতে পারে না। পরিবারের বোঝা হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা- আর টানাটানির সংসারে আরও টানাটানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

এমনও পরিবার দেখা গেছে যে, রোগীর চিকিৎসা করানোর জন্যে পরিবারের জমিজমা, ঘরবাড়ি, থালাবাসন, এমনকি বিছানাপত্র পর্যন্ত বিক্রি করে রোগীর চিকিৎসা করার চেষ্টা চলে। কিন্তু তবু কোনই ঈর্ষ হয় না- রোগী বাঁচে না। এই ক্ষয়রোগে বাংলার বহু মানুষকে ক্ষয় করেছে।

বাংলার আরেকটি মারাত্মক রোগ কলেরা। এ রোগ পানি বাহিত। বিশুদ্ধ পানি পান না করা এ রোগের মূল কারণ হলেও বাসি, পচা, খাবার খেলে এবং অপরিষ্কার থাকলেও এরোগ হয়। কলেরা রোগটি টর্নেডোর মতো। টর্নেডো যেমন এক ঝাপটায় ঘর বাড়ি গাছ গাছালী, দালান কোঠা লগুভঙ করে দেয়, ভেঙে চুরমার করে তেমনি কলেরা রোগটি মহামারী আকারে দেখা দিয়ে গ্রামকে গ্রাম, এলাকা থেকে এলাকা সাবাড় করে ফেলে। যেহেতু কলেরা একটি সংক্রামন রোগ, কোনো পরিবারের একজনের হলে ঐ পরিবারের অন্যান্যেও আক্রান্ত হয়ে যায় ফলে পরিবারের সব সদস্য মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

দান্ত আর বমি এ রোগের লক্ষণ। মেয়াদ মাত্র ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ একদিন একরাত। এর মধ্যে ফলপ্রসূ চিকিৎসা হলে রোগী বাঁচবে নইলে মৃত্যু নির্খাত। এই ভয়ঙ্কর রোগে বাংলার বহু লোক মৃত্যুবরণ করেছে। বহু পরিবার শেষ হয়ে গেছে।

এ রোগের কারণ যেহেতু দূষিত পানি- পচা বাসি খাবার এবং অপরিচ্ছন্নতা সেহেতু এ রোগ বলা চলে দরিদ্র জনেরই। কখনও শোনা যায়নি কোনো ধনি-সম্পদশালী বিত্তবান লোক কলেরায় মারা গেছে। শুধু গরীব লোকের কথাই শোনা গেছে যে কলেরায় মারা গেছে।

বাংলার আর একটি রোগ বসন্ত। এ রোগ কেন হয়- কোন জটিল জন্মে হয় এটা তখন কেউ জানতো না। এ রোগ দুই প্রকারের গুটি বসন্ত ও জল বসন্ত। জল বসন্ত তেমন মারাত্মক নয়- শরীরে মুগুরীর দানার

মতো লাল লাল বিচি দেখা দেয়। সারা গা, মাথা, চোখ ইত্যাদি ব্যথা করে। গায়ে একটু একটু জ্বরও থাকে। ১০/১৫ দিন পর জল বসন্ত সেরে যায়।

কিন্তু যার গুটি বসন্ত হয় তার আর রক্ষা থাকে না। শরীরে বড় বড় ফোড়ার মতো ক্ষতের সৃষ্টি হয় এক সময়ে দেহের মাংস পচে গলে পড়তে থাকে। চোখ অন্ধ হয়ে যায়—রোগীর দেহ দিয়ে পচা গন্ধ বের হয়—কেউ তার কাছে যেতে পারে না। ভুগে ভুগে রোগী অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এ রোগও মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং বাংলার বহু মানুষ এ রোগে মৃত্যুবরণ করে।

কলেরা ও বসন্ত রোগ দু'টি সম্পর্কে বাংলার মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে, রোগ দু'টি মানুষের আকৃতিতে গ্রামে বন্দরে বা শহরে ঢোকে এবং একের পর এক লোককে সংহার করে চলে যায়। হিন্দু সম্প্রদায় মনে করতো ওলাবিবি আসে। এজন্যেও কলেরাকে ওলাওঠাও বলা হতো। সাধারণত ওলাবিবির আসার সময় হতো গ্রীষ্মকালে এজন্য হিন্দু সম্প্রদায় ওলাবিবির ক্রোধ দমনে পূজারও ব্যবস্থা করতো। পূজা অর্চনার মাধ্যমে ওলাবিবির আক্রোশ দমনে সচেষ্ট হতো।

বসন্ত রোগেরও পূজা হতো। মুসলমান সম্প্রদায়ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তারাও এ দুই রোগের হাত থেকে তাবিজ তুমার করতো। অর্থাৎ কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়া প্লেগ যক্ষা ইত্যাদি রোগ এতোটাই মারাত্মক ছিল যে বাংলার জন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদেশীরা অর্থাৎ পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা এ রোগগুলোর ভয়ে এদেশে আসতেই চাইতো না।

জনদরদী হাজী মুহম্মদ মুহসীন এসব ব্যাপার জানতেন। মুহসীনের প্রাণ কেঁদে ওঠতো জনগনের দুঃখ বেদনায় তিনি দিনে রাতে ভাবেন কী করে গরীব দুঃখীদের এসব রোগ বলাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

তিনি প্রথমে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে এটা বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এগুলো রোগ। মানুষের বা কোনো ভূত প্রেতের মূর্তিতে এ রোগ আসে না। নির্দিষ্ট কারণে এসব রোগ হয়ে থাকে।

মুহসীন সবাইকে তার বিশেষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে, বিশুদ্ধ পানি ও বিশুদ্ধ খাবার খেলে, ডোবা-নালা, ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার রাখলে, ইঁদুরের হাত থেকে নিজে সতর্ক রাখলে এসব রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

মুহসীনের এ উপদেশে কিছু কাজ হলেও প্রকৃতপক্ষে দরকার ছিল এসব রোগের চিকিৎসার। এই জনদরদীই প্রথম এসব ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্যে হুগলীতে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। আরো বিশ্বয়ের ব্যাপার চিকিৎসালয়টি দাতব্য। অর্থাৎ বিনামূল্যে সেখানে রোগীদেহ চিকিৎসা হবে।

একটি হাসপাতালের খরচ যে বিপুল এটা অন্তত সবাইর জানা। ডাক্তার নার্সদের বেতন, সুইপার ঝাড়ুদারদের বেতন, ওষুধ পত্র, আসবাবপত্র এবং অপারেশনের যন্ত্রপাতির খরচ— এ বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়া কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সাধারণত সম্ভব হয়ে ওঠে না। যে জন্যে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের উদ্যোগে হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যক্তি হাজী মুহম্মদ মুহসীন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেন। গরীব দুঃখী অভাবী জনগনকে ভালোবেসে তিনি তার বোনের কাছ থেকে পাওয়া সকল সম্পত্তি জনগনের উপকারার্থে বিলিয়ে দিতে থাকেন। এমন মানব প্রেমী তখনকার দিনে এমন কি এখনকার দিনে আর একজনও দেখা যায় না।

হাজী মুহসীনের নিজের তো ধন সম্পদ ছিলই এর উপর তার বোনের যে সম্পত্তি তিনি পেয়েছেন সে সম্পদও তিনি জনসেবায় ব্যয় করতে থাকেন। নিজের জন্য সামান্য কিছু রেখে বাকি সব গরীব দুঃখীর জন্যে নির্ধারণ করেন।

তার বোন মনুজানের জমিদারি ছিল। সে জমিদারি বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর এবং ঢাকার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইসব এলাকার মালিকানা ও কর্তৃত্বের অধিকারী মুহসীন হন। কিন্তু এই বিশাল জমিদারীর কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও মুহসীন অতি সাধারণ জীবন যাপন করেন। তিনি সাধারণভাবে চলেন, সাধারণ মানুষের মাঝে উঠাবসা

করেন। সাধারণ মানুষের মতো ঘুরে বেড়ান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, নিয়মিত কোরানশরীফ পড়েন, রোজা রাখেন। মানুষকে সৎ উপদেশ দেন। সৎভাবে জীবন যাপন করার উৎসাহ দেন।

তিনি ঘরে বসে থাকেন না। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর এবং ঢাকা তার জমিদারী এলাকায় প্রায় প্রায়ই ঘুরে বেড়ান। যেখানেই তিনি গরীব দুঃখীদের সমস্যা দেখেন, সেখানেই তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করেন এবং সমস্যার সমাধান করতে লেগে যান।

একবার তিনি যশোর এবং খুলনা এলে দেখতে পাশ, মিষ্টি পানির অভাবে এ এলাকার মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে। মুহসীন দুই জায়গায় দু'টি সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশে প্রচুর লোক সম্মগম হয়। সমাবেশে তিনি বলেন

‘ভাইসব, আমি আপনাদের এলাকা ঘুরে দেখতে পেলাম মিষ্টি, পানির অভাবে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন। একে তো খাওয়ার পানি পাচ্ছেন না, অন্যদিকে মাছ-চাষ হচ্ছে না। এমত অবস্থায় কি করা দরকার?’

সমাবেশে উপস্থিত সবাই অবাক হলো এই ভেবে যে-এতদিন ধরে তারা যে ব্যাপারে কষ্ট পাচ্ছে, সেটা মুহসীন বুঝে ফেলেছেন, তাদের মুখ থেকে প্রকাশ করার আগেই মুহসীন সেটা তাদের কাছে উত্থাপন করলেন। উপস্থিত সবাই অভিভূত হলো।

তারা জানালো যে, তাদের কয়েকটি পুকুর খনন করে দিলে তারা খুবই উপকৃত হয়। হাজী মুহসীন বললেন—

‘আগামীকাল থেকেই যশোহর এবং খুলনায় যে কয়টা পুকুরের দরকার খনন করা শুরু করুন। পুকুর খনন করার যাবতীয় ব্যয় আমি বহন করবো। আপনারা শ্রম দেবেন, আপনাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি দিয়ে দেবো।’ সমাবেশে এই ঘোষনার পর সবাই মুহসীনের নামে ধন্য ধন্য রব তুললো।

পরের দিন থেকে যশোহর এবং খুলনায় ২০টি বড় বড় পুকুর খনন শুরু হয়ে গেল। মুহসীন একবার যশোহর একবার খুলনা এভাবে ঘুরে ফিরে পুকুর খননের কাজ তদারকি করতে লাগলেন। যত দিন পর্যন্ত পুকুর

খনন শেষ না হলো ততদিন পর্যন্ত তিনি যশোহর এবং খুলনাতেই অবস্থান করলেন ।

অতঃপর দীর্ঘ একমাস পর ২০টি পুকুরের খনন কাজ শেষ হলো । পুকুরে যেদিন পানি এলো সেই পানি মুহসীন প্রথমে একজন অতি দরিদ্র ব্যক্তিকে দিলেন এবং হাত তুলে উপস্থিত সবাই আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে শুকরিয়া আদায় করলেন ।

মুহসীন যেদিন যশোহর এবং খুলনা থেকে বিদায় নেন সেদিন হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয় । হাজার হাজার নারীপুরুষ কৃতজ্ঞতার সাথে মুহসীনকে বিদায় জানান । বিদায় কালে সকলের উদ্দেশে মুহসীন বলেন—

‘এ বিশ্বের সবকিছুর মালিক পরম করুণাময় আল্লাহতায়াল্লা । তিনি তার বান্দাদের বড়ই ভাল বাসেন । কোনো বান্দাই তার কাছে অপ্রিয় নয় । কোনো মানুষ অপর একজন মানুষকে কষ্ট দিলে, আল্লাহ কষ্ট পান । কোনো মানুষ অপর একজন মানুষের জন্যে কিছু করলে আল্লাহ খুশি হন । তাই আমরা যদি পরস্পর পরস্পরের ভালোর জন্যে কাজ করি মহান আল্লাহ পাক খুশি হবেন । আমাদের সকল কাজে কর্মে বরকত নেমে আসবে । দুঃখ দুর্দশা থাকবে না । তাই, আমরা যেন একে অপরকে ষ্ট্রনা না করি, হিংসা না করি । বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা বস্তুত কেউ কারো ক্ষতি না করি । পরস্পর মিলে মিশে থাকি । আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন ।’ চোখের পানিতে সবাই মুহসীনকে বিদায় জানায় ।

খুলনা ও যশোহর বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত । সাগরের পানি লোনা । লোনা পানিতে চিৎড়ি মাছের চাষ হতে পারে— চিৎড়ি মাছ খুব ভালো হয় এটা ঠিক কিন্তু ফসলের জন্যে লোনা পানি খুবই ক্ষতিকর ।

খুলনা যশোহরে নারিকেল সুপারী গুড় যথেষ্ট হলেও ফসলের ভীষণ ক্ষতি হওয়া শুরু হয় । কৃষি কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কারন খুঁজে দেখতে পেল—লোনা পানি ক্ষেতে ঢুকে পড়ায় ফসল উৎপাদনে ব্যাহত হচ্ছে । তারা ভেবে দেখলো সাগরের পানি আসা বন্ধ করতে পারলে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করা যাবে নচেৎ নয় ।

কিন্তু এটা বিরাট ব্যাপার । কেননা খুলনা ও যশোহরের সমুদ্র উপকূল

বরাবর বেরীবাঁধ দিতে হবে। অর্থাৎ প্রায় ৩০/৪০ মাইল পর্যন্ত লম্বা একটি উঁচু বাঁধ নির্মান করতে হবে। যে বাঁধ প্রশস্ত হতে হবে, উঁচু হতে হবে, মজবুত হতে হবে যেন সাগরের ঢেউ বাঁধ ভাঙতে না পারে, বাঁধের নিচে সমুদ্রের পানি থাকে। অর্থাৎ কোনোক্রমেই যেন সাগরের পানি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

ফসল রক্ষার পথ তো বের করা হলো কিন্তু বিপুল অর্থ ব্যয়ে এ বাধ তৈরী করা যায় কিভাবে। জনগণের চাঁদায় এটা সম্ভব নয় কেননা, জনগণের মধ্যে বেশির ভাগই দরিদ্র তারা চাঁদা দেবে না। শহরের যারা ধনাঢ্য ব্যক্তি তারা একাজে এগিয়ে আসবে না— কারণ তারা বিনা লাভে কোথাও টাকা লগ্নি করে না। যশোহর ও খুলনাবাসীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

হঠাৎ তাদের মাথায় উদয় হলো দানবীর ও দয়ালু হাজী মুহম্মদ মুহসীনের কথা। এলাকার মুরুব্বী শ্রেণীর লোক কয়েকজনে মিলে মুহসীনের সাথে দেখা করার মনস্থ করলো। তাদের বন্ধমূল ধারণা—দয়ালু মুহসীনকে জানালে, তিনি গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং তিনি রাজি হলে খুলনা ও যশোহর বাসীর বহুদিনের একটি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কয়েকজন মুরুব্বী হুগলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন তার নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। তার সামনে বেশ ক'জন—লোক বসে আছে। এমন সময় মুহসীনের কাছে খবর পৌঁছালো, যশোহর ও খুলনা থেকে ক'জন লোক এসেছে তার সাথে দেখা করতে। মুহসীন বলে পাঠালেন—

‘তাদেরকে অতিথিশালায় নিয়ে যাও— হাত মুখ ধুয়ে তারা খাওয়া দাওয়া করবে, বিশ্রাম নেবে, তারপর তাদের সাথে কথাবার্তা হবে।’

অতিথিরা অতিথিশালায় গিয়ে বসিত। তারা দেখলো তাদের হাত মুখ ধোয়ার জন্যে বদনা মাটিতে প্রস্তুত। কয়েকজন পরিচারক তাদেরকে আপ্যায়নের জন্যে অপেক্ষমান। তারা ক্ষুধার্ত ছিল। তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেলো। খাওয়া শেষে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটি ঘরে। তারা

দেখলো, তাদের বিশ্রামের জন্যে বিছানা পত্র তৈরি। পরে তারা জানতে পারলো— প্রতিদিনই শত শত অতিথি মুসাফির আসছে। তাদের খাওয়া দাওয়া আপ্যায়নের জন্যে খানা সর্বদা তৈরি রাখা হয়। প্রায় ৫০ জন লোক দিনরাত অতিথি আপ্যায়নে নিয়োজিত রয়েছে।

অতঃপর তাদের ডাক পড়লো। মুহসীনের কাছে তারা সমস্যার কথা তুলে ধরলো—

‘সমুদ্রের নোনা পানিতে খুলনা ও যশোহরের সকল ফসল বিনষ্ট হচ্ছে প্রতি বছরই এ ঘটনা ঘটান ফলে বিপুল পরিমাণ শস্যাদির ক্ষতি হচ্ছে— এতে শুধু খুলনা ও যশোহরবাসীরই ক্ষতি হচ্ছে না বরং পূর্ববঙ্গের মানুষেরও ক্ষতিসাধন হচ্ছে। সাগর উপকূল দিয়ে যদি একটি বেড়িবাঁধ দেয়া যায় তাহলে এই ক্ষতি বন্ধ করা যায়।’

মুহসীন শুনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—

‘এতো বড় একটি সমস্যা কেন আপনারা এতোদিন বুকে পুষে রেখেছেন। আমাকে কেন আরও আগে বলেননি। যান বেড়িবাঁধের ব্যবস্থা করান। সাগর সীমানা থেকে যতদূর পর্যন্ত বাধ দেয়া দরকার, বাধ যতো উঁচু, প্রশস্ত ও শক্ত করা দরকার করবেন। টাকার চিন্তা করবেন না।’

এই বলে তিনি কয়েক হাজার টাকা তাদের হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন— ‘কোনো দেরি করবেন না— ফিরে গিয়েই কাজ শুরু করে দেবেন। বাধ নির্মাণ শেষ হলে আমাকে খবর দেবেন, আমি গিয়ে দেখবো— মাঝখানে টাকার প্রয়োজন হলে চলে আসবেন। মানুষ যেন কষ্ট না পায়। মানুষ কোনো কারনে কষ্ট পেলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কষ্ট পান। আপনারা যান কাজ শুরু করুন, আল্লাহ আপনাদের সহায় হবেন।’

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বেরিবাঁধ নির্মাণ শুরু হলো। সাগরের তীর থেকে কিছু দূর দিয়ে বেরীবাঁধ নির্মাণে শত শত লোক কাজে নেমে পড়লো। সবার মুখে মুহসীনের জয়গান— এমন দরদী হৃদয়বান মানুষ তারা আর কখনও দেখেনি। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকে বেরীবাঁধ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করে।

বাধ নির্মিত হলো। মুহসীনকে জানানো হলো। তাকে নিয়ে আসা

হলো। মুহসীন বেরিবাঁধের শুরু থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে দেখলেন। শেষ প্রান্তে এক সমাবেশ ঘটে, সে সমাবেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলের উদ্দেশে বলেন—

‘ভাইসব, এ পৃথিবী নশ্বর। এ পৃথিবীতে আমরা কোনোদিন ছিলাম না, এ পৃথিবীতে আমরা একদিন থাকবো না। আমাদের জায়গায় নতুন মানুষ আসবে, বসবাস করবে। অর্থাৎ আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আমাদেরও স্থায়ী বাসস্থান আখেরাত। সেখানেই আমাদের অনন্তকাল বসবাস করতে হবে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমরা যা করে যাবো সেই কর্মের উপর আল্লাহ তায়্যলা বিচার বিবেচনা করবেন। আমরা যদি ভালো কাজ করি ভালো ফল পাবো। মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল পাবো। তাই, আমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আমরা সর্বদা ভালো কাজ করতে চেষ্টা করবো— ভালো মন নিয়ে সবার সাথে চলা ফেরা করবো।’

হাজী মুহম্মদ মুহসীন ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ও অনুরাগী ছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি আরকান বা স্তম্ভ তিনি যথাযথ পালন করে চলতেন। ইসলাম ধর্ম কেমন ধর্ম যার প্রতি হাজী মুহম্মদ মুহসীন এতটা আকৃষ্ট ছিলেন সেটা জানা দরকার। ইসলাম ধর্ম হচ্ছে—

ইসলাম হলো শান্তি ও সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। তাই মানুষে মানুষে বিভেদ ইসলাম পছন্দ করে না। হজরত মুহম্মদ (সাঃ) এর মতে —

‘সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ যে অপরের মঙ্গল সাধন করে।’

ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যে ব্যক্তি সদয় নয়, আল্লাহ তার প্রতি সদয় মন। কোনো ব্যক্তির নিজের জন্য যা কামনা করে তার ভায়ের জন্য তাই কামনা না করলে সে প্রকৃত বিশ্বাসী নয়।

নিরন্নকে ann দান, অতি পীড়িতের সেবা করা, অন্যায়ভাবে আটক বা জেল হাজতীকে মুক্ত করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, সঙ্গী-সাথীদের ভালবাসা ইসলামের অন্যতম আদর্শ।

ইসলাম নতুন কোনো ধর্ম নয়। মানুষ পৃথিবীতে প্রথম যেদিন এসেছে সেদিন থেকেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তি লাভের জীবন বিধান আল্লাহ মানুষকে মেনে নিতে বলেছেন।

ইসলাম এমন এক চিরন্তন এবং মৌলিক বিধান যা মানুষকে জীবনের চলার পথে প্রতিনিয়ত দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

পবিত্র কোরআনের একটি মর্মবানী এই—

‘আল্লাহ যদি চাইতেন তবে সবাইকে একজাতীয় লোক করতেন, কিন্তু তিনি মানুষের (বিচার-বুদ্ধির) পরীক্ষা করতে চান, তাই কল্যানের পথে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক।’

জগত আল্লাহর পরিবার। সে-ই আল্লাহর কাছে ভাল যে তার পরিবারের প্রতি ভাল।

হাদিসে বলা হয়েছে—

‘সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, ‘সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়, সে আল্লাহতে বিশ্বাসী নয়,— যার আঘাত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’

নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবস্থা হজরত মুহম্মদ (সাঃ) নিজের চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্যনীয়।

হজরত মুহম্মদ যখন মদিনার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তখন একদিন তার ধাত্রী দেখা করতে যান। ধাত্রীকে দেখা মাত্র মুহম্মদ (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের পাগড়ীখানা বিছিয়ে দিলেন ধাত্রীর বসার জন্যে।

উপস্থিত সকলে এটা থেকে মুহম্মদের (সাঃ) নারীর প্রতি সম্মানবোধে অভিভূত হলেন।

ইসলাম মানব কল্যাণ বিশ্বাসী। কোরআন এবং হাদিসে সাম্য ও সখ্যতার কথা বারবার বলা হয়েছে। কোরআনে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের কথাও বলা হয়েছে। কোরআন ঘোষণা করে—

“.....বিশ্বাসীগণ পরস্পর ভাই ভাই, পুন্য ব্যতিরেকে একজন অন্যজন হতে বড় নয়।.....ইসলামে ভ্রাতৃত্বের ধারণা কাগজে কলমে নয়, ধর্মীয় কর্যকলাপের মাধ্যমে এই ভ্রাতৃত্ব ব্যবহারিক রূপ পেয়েছে। ধনী গরীব, রাজা প্রজা, প্রভু-ভৃত্য সবাই মসজিদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে।

“জ্ঞানানুসন্ধান প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক।” জ্ঞান অর্জন কর, কেননা জ্ঞান তার অধিকারকে সত্যমিথ্যার মধ্যে পার্থক্য

নির্ণয় করতে শেখায়।” হজরত আলী বলেন,

“জগতের জ্ঞান বিশ্বাসীর হারানো ভেড়াশ্বরূপ, অবিশ্বাসীর কাছ থেকে এলেও একে রেখে দাও।”

হজরত মুহম্মদ (সাঃ) কোরআনকে চির আলোকময় ও চিরগতিশীল চন্দ্র-সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন—

“পবিত্র কোরআন কেবল মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার খোরাক নয়; হৃদয় এবং আত্মার খোরাক।”

মানব জীবনের সকল অঙ্ককার তথা অজ্ঞানতা, অনৈতিকতা, অন্যায় অবিচার প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অঙ্ককার দূর করার লক্ষ্যে কোরআনের আবির্ভাব হয়েছে। বস্তুত কোরআনের লক্ষ্য হচ্ছে সমুদয় অনৈতিকতা ও সামাজিক জনমতকে ধ্বংস করে মানুষকে সত্য, ন্যায়, সুন্দর এবং কল্যান তথা আলোর পথে পরিচালিত করা।

দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ বলেছেন—

“ধর্মের যুগ অতিক্রান্ত। আমার বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সবকটি ধর্মই নিঃশেষ ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের চিরজীব ও শাস্বত হয়ে থাকার বিশেষত্ব এবং যোগ্যতা বর্তমান। কেননা এ ধর্ম সবদিক দিয়ে উন্নত। সমাজ ও সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলাম কেবল ধর্মীয় ব্যাপারেই গুরুত্বারোপ করেনা, সমস্ত জৈবিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।”

এই আলোকিত ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন হাজী মুহম্মদ মুহসীন। আর এই ধর্মের আলোকচ্ছটায় মুহসীন তার জীবন আমরণ পরিচালিত করেন।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড মেকলে তার Essay of Lord Clive গ্রন্থে লিখেছেন,

‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বা সরকারের স্বার্থে নয় বরং কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বার্থেই তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছিল।’

দিল্লীর সিংহাসন দখল করার পর ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষের মুঘল স্থাপত্য ‘তাজমহল’ ও ‘ময়ূর সিংহাসনের’ বহু মূল্যবান ‘কোহিনূর হীরা’ ও

‘মনিমুক্তা’ লুট করে নিয়ে বাকিংহাম প্রাসাদের শোভাবর্ধন করে।

ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষের অমুসলিম হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভৃতি গোষ্ঠীকে হাতের মুঠোয় রেখে মুসলমানদের সকল ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করে। ওদিকে অমুসলিম গোষ্ঠীকে শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসা-বানিজ্যে, সরকারী চাকরিতে এগিয়ে নিয়ে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এদেশের মুসলমানদের দাস বা গোলামে পরিণত করে। ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হানটারের লেখা ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস’ গ্রন্থটিই এর স্বাক্ষর বহন করে।

একদিকে ইংরেজ শাসকদের দুর্নীতি ও দমননীতি অপরদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের হিংসা বিদ্বেষ ও ঈর্ষার নীতির ফলশ্রুতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানেরা শিক্ষা দীক্ষায়, অর্থে সামর্থে, ব্যবসা বানিজ্যে এবং রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যায়। অমুসলিমদের পদানত প্রায় এ দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষাদানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমেই বাধার সৃষ্টি করে।

মুসলমানদের বহু মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়। বহু মাদ্রাসা শিক্ষককে হত্যা করা হয়। ইংরেজদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম আত্মসন চিরতরে নির্বাপিত করা। খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণবাদীরা যৌথভাবে এদেশে মুসলিম নিধন শুরু করে। উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে।

এই অন্যায়ে বিরুদ্ধে ১৭৭০ সালে শুরু হয়েছিল বাংলায় ফকির মজনু শাহের ফকিরী আন্দোলন। কিন্তু ইংরেজরা অত্যাচার ও অবিচারের স্তীমরোলার চালিয়ে ফকির বিদ্রোহ দমন করে।

ইংরেজ শাসন ক্রমে এদেশের সমাজ ও মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। ইংরেজদের শোষণ ও পীড়নের কারণে ধীরে ধীরে এদেশের মানুষ অধিকার সচেতন হয়। তারা জেগে উঠতে থাকে। আর এভাবেই নানা আন্দোলন ও সংগ্রাম শুরু হয়। সাথে সাথে এদেশের কতিপয় শিক্ষিত সচেতন মানুষ বুঝতে পারেন সমাজ জীবনে প্রচলিত নানা দুর্বলতা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে দূর করতে হবে এবং মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে

হবে। তাহলেই সম্ভব হবে সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা।

পলাশীর যুদ্ধে বাংলায় রাজনৈতিক ও সামাজিক নানাবিধ পরিবর্তন আসে। দেশবাসী এসব পরিবর্তন একেবারে নিরবে মেনে নেয়নি। রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীনও ছিল না। অবশ্য তখনও জাতীয়তাবাদী চেতনা দেখা দেয়নি। অর্থাৎ বাংলার সকল ধর্ম ও মতের মানুষ যে এক জাতি এবং একই দেশের অধিবাসী এমন ঐক্যবদ্ধ চিন্তা তাদের হয়নি। ব্রিটিশ এবং ব্রিটিশদের দোসর জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে যেসব আন্দোলন সংঘটিত হয় সেগুলোর মধ্যে ফকির আন্দোলন, তিতুমীরের সংগ্রাম, ফরাজী আন্দোলন ও নীল বিদ্রোহ প্রধান।

আধুনিক শিক্ষার পূর্বে মুসলমান সমাজে জনগণের নেতা ছিলেন পীর, ফকির ও আলেমগণ। মুঘল আমলে এদেরকে নিষ্কর ভূমি দান করা হতো। তারা অবাধে ধর্মীয় কার্যলিপি চালাতে পারতো। তাই তারা শান্ত ছিল।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এ নীতির পরিবর্তন করে। তাই ফকিরগণ বেশ কিছু ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করে। ১৭৮০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এ সকল আন্দোলন সংঘটিত হয়।

সে আমলে ফকিরগণ বিভিন্ন সংঘে বিভক্ত ছিল। একটি সংঘের সকল সদস্য এক সাথে এক তীর্থে থেকে অপর তীর্থে ঘুরে বেড়াতো। তারা সংসারী জীবন যাপন করতো না। মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করে তারা জীবন ধারণ করতো। নিরাপত্তার জন্য তারা হালকা ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র সাথে রাখতো।

ব্রিটিশ সরকার ফকিরদের অবাধ চলাচলে বাধা দেয়। তাদের মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাদের অস্ত্র বহনকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। এভাবে ফকিরদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ। -

ফকিরদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল অবাধে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহের

মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করা। তারা জাতীয়তাবোধে তেমন উদ্বুদ্ধ ছিল না।

ফকিরগণ বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজদের বিভিন্ন কুঠি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। তবে উত্তরবঙ্গ ছিল তাদের আন্দোলনের মূল কেন্দ্র।

ফকিরদের দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সৈন্য পাঠায়। কিন্তু ফকিরদের যুদ্ধের কৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও পলায়ন। মজনু শাহকে ব্রিটিশরা পরাজিত করতে পারেনি।

১৭৮৭ সালে ফকির মজনু শাহের মৃত্যু হয়। এর পর ফকিরদের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, চেরাক আলী শাহ, সোবহান শাহ, মাদার বকস ও করিম শাহ প্রমুখ ফকির।

১৮০০ সালের মধ্যে ফকিরগণকে চূড়ান্তভাবে দমন করা হয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, যুগে যুগে এমন একেক জন মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটে যিনি সারা দুনিয়ার রূপ বদলিয়ে দেন।

এরকমই একজন যুগ-নায়ক ছিলেন আবদুল ওহাব। মুসলমানদের পবিত্র যিয়ারতগাহ মক্কা-মদীনায়ে অনৈসলামিক কার্যাবলী দেখে মর্মাহত হয়ে ইসলামকে সংস্কার ও অনাচারমুক্ত করার সংকল্প নিয়ে তার সংগ্রাম শুরু হয়।

তার এই সংস্কার আন্দোলনই ওহাবী আন্দোলন।

আবদুল ওহাব প্রচারিত ওহাবী আন্দোলনের পরবর্তী বিশিষ্ট নেতা সৈয়দ আহমদ। সৈয়দ আহমদের সময় এ ফরায়েজী আন্দোলনও ওহাবী ফরায়েজী আন্দোলনে মিলিত হয়ে এক সংগ্রামী রূপ ধারণ করে।

এরই সমসাময়িক ছিলেন বাংলায় তিতুমীরের জাগরণ।

প্রকৃতপক্ষে সৈয়দ আহমদের বালাকোট পতনের পরও সারা ভারতে ওহাবী আন্দোলন ও মুসলিম জাগরণের আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে মনে করলে ভুল করা হবে।

সৈয়দ আহমদ তার মুরিদানের অন্তরে যে অহিমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর পরও তা অনিবার্ণ শিখায় জ্বলছিল। এরই পরিনতি দেখা যায়

সীমান্তে, ইস্তানায়, পাটনায়, টঙ্কে এবং দেওবন্দের মুজাহিদ আন্দোলনে।

তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল অধিক। তারা ইংরেজদের পদলেহন করে নিজ ও গোষ্ঠীর স্বার্থ আদায় করে নিতো। স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা অসত্য কথা কাহিনী ইংরেজদের কানে ওঠাতো।

এতে মুসলমান সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে।

ইংরেজরা হিন্দুদের খাতির যত্ন করতো। কেননা তাদের সহযোগিতায় ইংরেজ শাসকগণ বাংলা এবং সারা ভারতে ক্ষমতা জমিয়ে নেয়।

এতে মুসলমান সম্প্রদায় পড়ে বেকায়দায়। মুসলমানদের মতো আত্মসম্পন্নবোধ ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজ কাফেরদের সাথে হাত মেলানো সহজ ছিল না। বিশেষ করে সৈয়দ আহমদ ও তিতুমীর শহীদানের শিক্ষার ফলে ইংরেজ জাতি ছিল মুসলমানদের কাছে আরও ঘৃণার পাত্র।

এ ঘৃণা ও আত্মসম্মান বোধের ফলে মুসলমানগণ আধুনিক শিক্ষা হতে যেমন পেছনে পড়ে রইলো, সেরূপ আর্থিক উন্নতিতেও ততখানি পচাৎপদ রইলো। এ অবস্থার ইঙ্গিত করেই প্রসিদ্ধ লেখক হানটার বলেছিলেন—

A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well born Mussalman in Bengal to become poor, at present, it is impossible for him to continue rich.

বাস্তবিকই এটি মর্মান্তিক যে— দেড়শ বছর আগে যে মুসলমানদের পক্ষে গরীব হওয়া ছিল অসম্ভব; তাদের পক্ষে বর্তমানে ধনী থাকাই অসম্ভব।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল। তারা, বলা চলে ইংরেজ ও হিন্দুদের গোলাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

হাজী মুহম্মদ মুহসীনের আমলে বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত ছিলো। বিশেষ করে মুসলমানদের

অবস্থা ছিল খুবই করুণ। হাজী মুহম্মদ মুহসীন বুঝতে পেরেছিলেন এক মাত্র শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষা বিস্তার ছাড়া এ জাতির অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি তার বিশাল সম্পত্তির প্রায় সবটাই ওয়াকফ করে দেন। তিনি নিজের ব্যায়ভার নির্বাহ করার জন্য সামান্য কিছু সম্পত্তি রাখেন যার মাসিক আয় ছিল মাত্র একশ টাকা।

মুসলমান গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থে ১৮০৬ সালের ২৬শে এপ্রিল এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার সম্পত্তি নিয়ে ‘মুহসীন ট্রাস্ট’ গঠন করা হয়। তিনি অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও সাহায্য করতেন।

তিনি অনেক কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান করেন। তার মধ্যে ‘হুগলী কলেজ’ ও ‘হুগলী মাদ্রাসা’ বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

মুহসীন ট্রাস্টের অর্থে হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ‘মুহসেনীয় মাদ্রাসা’ নামে চারটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।

এ ছাড়াও কলিকাতা মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বিস্তারিত বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম বঙ্গে আজও ‘মুহসীন ট্রাস্টের বৃত্তি’ দান প্রচলিত আছে।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন বহু মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ছাত্রদের খাওয়া দাওয়া, থাকা, কাপড় চোপড় ও বই পুস্তকের ব্যবস্থা তিনি করতেন। এছাড়া তিনি শিক্ষকদের বেতন দিতেন। অর্থাৎ মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদের যাবতীয় খরচ তিনি বহন করতেন।

হুগলী ছিল মুহসীনের দান-খয়রাতের কেন্দ্রস্থল। হুগলী থেকে বর্ধমান, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পূর্নিয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও ঢাকা পর্যন্ত তার দান কার্য বিস্তারিত ছিল। অসংখ্য ছাত্র, অসংখ্য মানুষ মুহসীনের দানের দ্বারা উপকৃত হয়—এখনও হচ্ছে।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন আমৃত্যু মানবকল্যাণে নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজের সুখ-স্বাস্থ্য, সাধ আহলাদ নিয়ে কখনো ভাববার অবকাশ পাননি। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। বোন মনুজান তাকে

বিয়ে করার জন্যে বললে তিনি জবাব দেন ‘মাফ করো বোন, আমার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র দেশবাসী আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। বিয়ে করে তাদের সেবা করা থেকে আমায় বঞ্চিত করো না।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন তার মানব কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন, থাকবেন চিরদিন। সমাজকর্মীর কাছে তিনি আদর্শ ও অনুপ্রেরনার উৎস হয়ে থাকবেন। কবি গোলাম মোস্তফা তার উদ্দেশ্যে কবিতায় বলেছেন—

‘পুন্য শ্রোক দানবীর, মহাপ্রাণ হাজী মুহসীন

কে বলে মরেছ তুমি, হে অমর, আছ চিরদিন।’

হাজী মুহম্মদ মুহসীনকে জীবতকালে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পীড়া দিয়েছিল সেটি হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। মুহসীনের সময়কাল ১৭৩২ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুরু (১৭৮৪ থেকে ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ) সুতরাং হাজী মুহসীন তার জীবদ্দশাতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মানুষদের করুণ অবস্থা চোখে দেখেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি : ১৭৭২ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার বাংলার দিওয়ানী শাসন সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ইজারাদারদের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদি চুক্তি করে। এর ফলে ধনী ফটকাবাজেরা প্রাচীন জমিদারদের চেয়ে বেশি নিলাম ডেকে ইজারা লাভ করে। তারা অধিক লাভের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে খুশি মতো রাজস্ব আদায় করতো। ফলে প্রজাদের ওপর খুব অত্যাচার হয়। হেস্টিংস তাই পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ইজারাদারি ব্যবস্থা তুলে দেয়। এরপর জমিদারদের সাথে একসনা বন্দোবস্ত করা হয়। যেসব জমিদার একসনা বন্দোবস্ত গ্রহণ করেনি, তাদের জমিদারি ইজারাদারদের সাথে বন্দোবস্ত করা হয়। সুতরাং অনিয়ম ও অত্যাচার রয়েছেই গেল।

অবস্থার উন্নতির জন্য ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি আইন পাস করে। এ আইন কলিকাতা কর্তৃপক্ষকে একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য নির্দেশ দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য :

ব্রিটিশ সরকার মনে করতো যে, ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এলে জমিদাররা ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবে। জমিদাররা জমির উন্নয়ন করবে। ফলে কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হবে। জমিদাররা সুবিধা ভোগ করবে। বিনিময়ে তারা সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে। অনুগত জমিদাররা হবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন :

১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। এই নতুন গভর্নরের ওপর নির্দেশ ছিল ভূমি ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী আইন প্রবর্তন করার। কর্নওয়ালিস ১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারদের সাথে একটি দশসন্না বন্দোবস্ত করে। তিনি ঘোষণা দেন—

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ (বোর্ড অব ডাইরেক্টরস) তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করলে এ দশসন্না বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হবে। বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ১৭৯২ সালে তার পরিকল্পনা অনুমোদন করে। ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ কর্নওয়ালিস দশসন্না বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে গৃহীত ব্যবস্থা :

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির ওপর জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রায়তেরা হয় তার প্রজা। মালিক হিসেবে জমিদার জমি বিক্রি করতে, দান করতে বা যে কোনো কাজে ব্যবহারের অধিকার লাভ করলো।

দশসন্না বন্দোবস্ত কালে জমিদারদের ওপর যে রাজস্ব ধরা হয়েছিল তা চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হলো। তবে রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধ করতে হতো। কোনো জমিদার নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তার জমি নিলামে বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করা হতো। নির্দিষ্ট দিনে সূর্য ডোবার আগে রাজস্ব পরিশোধের বিধান ছিলো বলে এই আইন ‘সূর্যাস্ত আইন’ নামে পরিচিত। জমিদারদের হাতে বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা রইলো না। তারা ভূমি-রাজস্ব ছাড়া আর কোনো প্রকার শুল্ক আদায় করতে

পারতো না ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল :

জমি জরিপ না করে রাজস্ব নির্ধারণ করায় কোনো কোনো জমিদারির রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল জমির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি । আবার কোনো কোনো জমিদারির রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল জমির পরিমাণ অপেক্ষা কম । সুতরাং রাজস্ব নির্ধারণের হার সুষ্ঠু ছিল না । যেসব জমিদার উচ্চ হারে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলো তাদের জমি অচিরেই সূর্যাস্ত আইনের অধীনে নিলামে বিক্রয় হয়ে যায় । তবে অধিকাংশ জমিদার ছিল স্বচ্ছল ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের অবস্থার উন্নতি হলেও প্রজাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি । জমিদাররা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামতো খাজনা বাড়াতে পারতো । জমিদারদের নায়েব-গোমস্তা এবং পাইক পেয়াদারা প্রজাদের ওপর নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করতো । সূর্যাস্ত আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে সরকারের কোষাগারে রাজস্ব জমা দিতে না পারায় বহু পুরনো জমিদার বংশ তাদের জমিদারি হারায় । অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় । তাদের ওপর নির্ভরশীল লোকজন অসহায় হয়ে পড়ে । অনেক ক্ষেত্রে ধনী ফটকাবাজরা এ সকল জমিদারি কিনে নেয় । প্রজাদের প্রতি নতুন জমিদারদের কোনো দরদ ছিল না । ফলে প্রজারা নির্যাতিত হতে থাকে ।

পরবর্তীতে জমির দাম বহুগুণে বেড়ে গেলেও সরকার জমিদারদের ওপর রাজস্ব বাড়াতে পারেনি । সুতরাং এদিক থেকে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার আয়করসহ প্রজাদের ওপর নানা প্রকার কর বসাতে শুরু করে ।

জমিতে প্রজার কোনো অধিকার না থাকায় প্রজারা কৃষি উন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেনি । অনেক জমিদার গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায় । সুতরাং গ্রামগুলো অবহেলিত হতে থাকে । অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ম্যালেরিয়া, কুসংস্কার ইত্যাদিতে গ্রামগুলো জর্জরিত হতে থাকে । দূর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অনেক গ্রাম উজাড় হয়ে যায় ।

দেশবাসীর এইসব অবস্থা হাজী মুহসীন নিজ চোখে দেখে সহ্য করতে

‘হুজুর, এই ব্যাটা চুরি করতে মহলে ঢুকেছিলো।’

মুহসীন তাকালেন চোরের দিকে। মার খেয়ে বেচারার অবস্থা একরকম কাহিল হয়ে গেছে। সে মাথা নিচু করে কাঁদছে। দেখে মুহসীনের মায়া হলো। তিনি অন্যান্যের উদ্দেশে বললেন—

‘আচ্ছা, তোমরা সবাই যাও। আমি ওর বিচার করছি।’ একজনে বললো—

‘হুজুর, এ ব্যাটা কিন্তু ভীষণ ধড়িবাজ। আপনাকে একা পেয়ে ফস করে ছুটে পালাতে পারে।’

মুহসীন জবাব দিলেন—

‘না কিছু হবে না— ও পালাবে না। তোমরা যাও।’

অন্যান্য সবাই চলে গেলে মুহসীন চোরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন—

‘তুমি সত্যি চুরি করতে এসেছিলে?’

চোর চুপ করে আছে। শুধু ডু করে কাঁদছে।

মুহসীন একটু ধমকের সুরেই বললেন—

‘চুপ করে আছ কেন—জবাব দাও।’

চোর তখন স্বীকার করলো,

‘হ্যাঁ হুজুর, চুরি করতে এসেছিলাম’

এই বলেই ধপ করে বসে পড়ে মুহসীনের পা জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো—

‘আমাকে মাফ করুন হুজুর আমি বাধ্য হয়ে এ কাজে নেমেছি, আমাকে মাফ করুন।’

মুহসীন বললেন—

‘ওঠো, মাকের কথা পরে। আগে বলো এই ঘৃণ্য কাজ কেন করতে এসেছো? তুমি পুরুষ মানুষ— দেহে তোমার যথেষ্ট শক্তি সামর্থ। পরিশ্রম করে অনায়াসে দু’পয়সা রোজগার করতে পারো। এমন নিন্দার কাজ কখনো করা তোমার উচিত নয়।’

চোর এবার কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো—

‘সব জায়গায় ঘুরেছি হুজুর, কিন্তু কোথাও কাজ পাইনি। আমি বড়ো

গরীব। ঘরে চার পাঁচজন ছেলেমেয়ে পরিবার সবাইকে নিয়ে না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা চেয়েছি। কেউ দেয়নি সবাই ধূর ধূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছেলেমেয়ে ক্ষিধেয় কাঁদছে— আজ তাদের পেটে একফোটা দানাপানি পড়েনি; হুজুর। কী করবো হুজুর বাপ হয়ে তাদের এমন কষ্ট কি করে দেখবো হুজুর। সহ্য হলো না, তাই কোনো উপায় না পেয়ে আজ বাধ্য হয়েই এমন মন্দ কাজ করতে বেরিয়েছি— এই আশায়, যদি কোথাও কোনো কিছু পাই নিয়ে গিয়ে ছেলে মেয়েদের দেবো—ওরা খেয়ে বাঁচবে।’

চোরের কথা শুনে মুহসীনের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠলো। তিনি চোরকে বললেন—

‘এমন অভাব তোমার সত্যি বলছে?’

চোর বললো—

‘হুজুর আপনি নবাব বাদশাহ গরীবের মা বাপ। আপনার কাছে মিছে কথা বলবো এমন সাহস আমার নেই।’

মুহসীন চোরকে বললেন—

‘শোনে ইহজীবনই আমাদের সব নয়—এরপর আছে পরকাল। আল্লাহ তায়ালাকে সর্বদা মনে রাখবে। তুমি-আমি যাইই করি না কেন—আল্লাহ পাক সবই দেখছেন। তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। পরের জিনিস চুরি করলে পরলোকে কঠোর শাস্তি পাবে। আল্লাহর কথা স্মরণে রাখবে—রসুলের তরিকা মতো চলবে। যতোদিন জীবিত থাকবে, কখনো এমন নিন্দার কাজ করবে না।’

চোর বললো—

‘আমাকে মাফ করুন হুজুর, আমি আর কখনও এ কাজ করবো না।’

মুহসীন চোরকে বললেন—

‘দেখো, আমি যা বলবো তা যদি তুমি করো, তবে তোমার জন্যে কিছু করতে পারি।’

চোর সোৎসাহে বললো;

‘হুকুম করুন হুজুর। আপনি যা বলবেন আমি তাইই করবো—চুরি আর

করবো না।’

মুহসীন বললেন—

‘যতোদিন বেঁচে থাকবে, পরের উপকার ছাড়া পরের অনিষ্ট বা ক্ষতির কাজ করবে না—পাপের কাজে পা বাড়াবে না। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদি করবে না—যদি আমার এ কথাগুলো রাখো তাহলে তোমাদের সব অভাব আমি দূর করে দেবো।’

আহল্লাদ খুশিতে কৃতজ্ঞতায় চোর কঁদে ফেললো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো—

‘হজুর, আপনি মানুষ নন, আপনি ফেরেস্তু। আমি চুরি করতে এসে ধরা পড়ে ভেবেছি, না জানি কপালে আজ কত লাঞ্ছনা আর মারধোর আছে—না জানি কতদিনের জেল আর কত টাকা জরিমানা হবে। আমার অনুপস্থিতিতে ছেলে মেয়ে পরিবারের কি কষ্ট ভোগই না হবে। চোরকে এমন মিষ্টি কথা তো দুনিয়াতে কেউ বলেনি—এমন সদয় ব্যবহার কেউ করেনি। কী বলে যে আমার মনের কথা আপনাকে জানানাবো হজুর।’

এই বলে সে মুহসীনের পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

মুহসীন তাকে ধরে উঠিয়ে বললো—

‘শান্ত হও। লোকে বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। তুমি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে অভাবে পড়ে তোমার স্বভাব নষ্ট হয়েছে। যাক্ আমি তোমার অভাব দূর করে দিচ্ছি। আপাতত তুমি দু’শ টাকা নিয়ে যাও—চাল ডাল গম আটা যা যা দরকার কিনে নিয়ে ছেলে মেয়েদের খাওয়াও, নিজে খাও। বাকি টাকা দিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করো। এর পরও মাসে মাসে তোমার কাছে পঞ্চাশ টাকা যাবে। এতে আশা করি তোমার সংসারে টাকাপয়সার কোনো অভাব থাকবে না।’

এই বলে মুহসীন ভৃত্যকে ডাকলেন, ভৃত্য এলে তাকে বললেন—

‘সকাল বেলায় রজব আলী খাঁ ও শাকের আলী খাঁ সাহেবদের কাছে একে নিয়ে যাবি। আমার নাম করে এখন দু’শ টাকা এনে দিতে বলছি। আর মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা এর নামে যেন পাঠানো হয় বলে দিবি। একে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দে।’

ভৃত্যের সঙ্গে চোর গেলো। ভৃত্য তাকে একটি ঘরে বসিয়ে খালাভর্তি খাবার নিয়ে এলো। খাবার খেতে বসে চোরের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো সে খাবার গুলোতে। চোরের মনে এই দুঃখই উদয় হলো—সে এতো খাবার খাচ্ছে আর তার সন্তানেরা সামান্য খাবারের জন্যে কেমন ছটফট করছে। সে তখন ভৃত্যকে বললো—

‘ভাই, এগুলো আমি ‘না’ খেয়ে আমার ছেলে-মেয়ে পরিবারের জন্যে নিয়ে যেতে চাই—’

ভৃত্য বললো—

‘না, এগুলো তোমার খাওয়ার জন্য—তুমি খাবে। তোমার ছেলেমেয়ে পরিবারের খাবারও দেয়া হবে—তুমি যাওয়ার সময় সেগুলো নিয়ে যাবে একথা শুনে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের দানের হৃদয়ের কথা ভেবে হতবাক হয়ে গেলো। এমন দয়াবান মানুষ দুনিয়াতে আর ক’জন আছে?

দ্বিতীয় ঘটনা—

ভিখারীর বাড়ি। এক চিলতে উঠোন। তার পাশে একটি মাটির ঘর। বেলা দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এসেছে। ঘরের বারান্দায় আঁচল পেতে শুয়ে ছিল একজন স্ত্রীলোক। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে একজন অন্ধ আঙিনায় প্রবেশ করলো। লাঠির ঠকঠক আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্ত্রীলোকটি শোয়া থেকে উঠে বসলো। অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—

‘ভিক্ষা করে কি এনেছো দাও—হাড়িতে একদানা চালও নেই যে ভাত চড়াবো।’

শুনে অন্ধ লোকটি বিরক্ত হয়ে বললো—

‘জানিস না আমি অন্ধ—দু’চোখে মোটেও কিছুই দেখতে পাই না।’

স্ত্রীলোকটিও বিরক্ত সহকারে জবাব দিল—

‘তুমি যে অন্ধ সে তো জনম ভরেই দেখে আসছি। তাতে হয়েছেটা কি শুনি নতুন আবার কি হলো?’

অন্ধ লোকটি বললো—

‘নতুন আবার কি হবে। অন্ধ আমি, কেউ হাত ধরে না নিয়ে গেলে যে চলতে পারি না।’

স্ত্রীলোকটি অসহিষ্ণু হয়ে বললো—

‘তাই বুঝি আজ কিছু পাওনি, কেমন?’

অন্ধ বললো—

‘লোকের দুয়ারে দুয়ারে না গেলে কি কেউ যেচে কখনো ভিক্ষা দেয়?’

স্ত্রীলোকটি একথা শুনে চিৎকার করে বলতে লাগলো—

‘ও বাবা গো, আমি কোথায় যাবো গো! এই মুখ পোড়ার হাতে পড়ে আমার হাড় কালী হয়ে গেলো। সারাটা দিন মুখে কোনো দানাপানি পড়েনি। সারাদিন কে কোথায় উপোস করে থাকে শুনি?’

অন্ধ লোকটি বিরক্তির সুরে বললো—

‘উপোস করে আছিস তো কি হয়েছে? আমি বুঝি রাজভোগ গিলে আসছি! যারা গরীব, তাদের রোজ খেতে নেই।’

স্ত্রীলোকটি কান্নার সুরে বললো—

‘না রোজ খেতে নেই। হা ভাতের হাতে পড়ে জীবনটা আমার কালী হয়ে গেলো।’

অন্ধ লোকটি এবারে ধমকে ওঠলো—

‘চুপ করে থাক। খবরদার, কানের গোড়ায় বক্ বক্ করবিনে।’

স্ত্রীলোকটি ঠেস মেরে কথা বলে—

‘ঈস, কানার আবার তেজ দ্যাখো না।’

অন্ধ প্রায় আপন মনে বলে ওঠলো—

‘রাতদিন কেবল খাই খাই। পেটে কি তোর রান্ধস ঢুকেছে?’

স্ত্রীলোকটি যেন জ্বলে ওঠলো—

‘খবরদার, মুখ সামলে কথা বলবে, বলে দিচ্ছি।’

অন্ধ লোকটি শ্লেসের সাথে বললো—

‘কেন, কী করবি তুই, মারবি নাকি?’

স্ত্রীলোকটি কঠোরতার সাথে বললো—

‘ইস্ মারবো না—ওকে চুমু খাবো। ঝেটিয়ে সোজা করে দেবো।’

অন্ধ লোকটি রেগে ওঠলো, বললো—

‘কি এতো বড় আত্মপর্দা! যতো বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা। লাঠি

দিয়ে বাড়ি মেরে তোর মাথাটা দু'ভাগ করে দেবো না!'

স্ত্রীলোক সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে বললো—

‘তবেরে কানার কানা তস্য কানা—ঝাঁটা মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে দিচ্ছি দাঁড়া।’

এই বলে সে উঠানের এককোণে রাখা ঝাঁটা হাতে নিয়ে এসে অন্ধকে এলোপাথারী পেটাতে লাগলো। অন্ধ লোকটি ওরে বাবারে মেরে ফেল্লোরে, কে কোথায় আছো বাঁচাওরে বলে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু স্ত্রীলোকটি অন্ধকে পেটাতে পেটাতে বলতে লাগলো—

‘ভাত দেবার মুরোদ নাই দিল মারার গোসাই—ভাত যদি দিতেই না পারবি তবে বিয়ে করেছিলি কেন?’

এমন সময়ে মুহসীন সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন—

‘ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও মা।’

মুহসীনকে দেখে স্ত্রীলোকটি লজ্জা পেলো, সঙ্গে সঙ্গে হাতের ঝাঁটা ফেলে দিয়ে ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে বললো—

‘ওমা কি লজ্জা-ভদ্রলোক যে।’

মুহসীন অন্ধ ব্যক্তি ও স্ত্রীলোকটির উদ্দেশে বললেন—

‘আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি, আমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। তোমাদের বুঝি আজ আহার হয়নি? আচ্ছা, এই এক থলে টাকা নাও এই টাকা দিয়ে খাবার দাবার কিনে এনে খাও। এটা শেষ হয়ে গেলে আমার কাছে যেও—আমি আবার দেবো।’

অন্ধলোকটি লাঠি ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগের সাথে বল্লো—

‘কে বাবা আপনি গরীবকে প্রাণে বাঁচালেন। আমাদের সেলাম নিন, হজুর।’

স্ত্রীলোকটি বললো—

‘আল্লাহ আপনার ভালো করবেন বাবা। গরীবের দুয়ারে যখন এসেছেন হজুর একটুখানি বসুন। হজুরের নাম আর ঠিকানা বলে গেলে দায়ে ঠেকলে গিয়ে হাজির হবো।’

মুহসীন বল্লেন—

‘যেয়ো, কোনো অসুবিধা নেই। আমার নাম মুহম্মদ মুহসীন। হুগলীর ইমাম বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করলে আমায় পাবে। কিন্তু একটা কথা তোমায় না বলে আমি পারছি না মা।’

স্ত্রীলোকটি উৎসুক হয়ে মুহসীনের মুখের দিকে তাকায়—

মুহসীন বলতে থাকেন—

‘স্ত্রীর জন্যে স্বামী হচ্ছে ইহ পরকালের সর্বস্ব। স্ত্রী হয়ে স্বামীর গায়ে হাত উঠানো তো দূরের কথা, স্বামীর মনে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো কাজ স্ত্রীর করতে নেই। স্বামীর সেবা করলে—স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখলে স্ত্রীর বেহেস্ত কবুল হবে—একথাটি যেনো কখনো ভুলে যেও না মা। স্বামীকে অবহেলা করলে সে স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার খুব অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্‌র গজব থেকে সর্বদা দূরে থাকবার চেষ্টা করবে।’

স্ত্রীলোকটি শঙ্কিত হয়ে বললো—

‘তাহলে কি আমার গুনাহ্‌ মাফ হবে না হুজুর?’

মুহসীন তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—

‘হ্যাঁ, হতে পারে। স্বামীর কাছে অপরাধের ক্ষমা চাও। স্বামী খুশি হলেই আল্লাহ্‌তায়ালার স্ত্রীর গুনাহ্‌ মাফ করতে পারেন।’

অন্ধ লোকটি আবেগাপ্ত হয়ে বললেন—

‘হুজুর আপনি মহান। আপনার নেক কথায় আমাদের অনেক জ্ঞান হলো। আপনার মেহেরবানীর কথা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।’

মুহসীন বললেন—

‘দেখ, পাপ করে যে অনুতপ্ত হয়, তারপর সেই কাজ আর যদি সে না করে, তবে যত বড়ো অপরাধই হোক না কেন—মেহেরবান আল্লাহ তাকে মাফ করেন।’

এই কথা বলে মুহসীন সে স্থান ত্যাগ করলেন। বাড়ী থেকে বের হয়ে তিনি মৃদুকণ্ঠে গাইতে গাইতে চললেন—

ইয়া পরোয়ার দিগার

আমি এক গোনাহ্‌গার

বুঝি না তোমার

মেহেরবানী ।
আমি শুধু চাই
ধন ও দৌলত
আমার কামনা
না ফরমানি ।
জীবন ভরিয়া চাই আরো চাই
যাহা দেহ তাহে দিল ভরে নাই ।
দাও রিজেক আরো
রোজগার আরো
সুখে দিন হোক
গুজরানী ।

তৃতীয় ঘটনা—
জনৈক গৃহস্থের বাড়ি এক ভিখারিনী ঢুকে একতারা বাজিয়ে গান গেয়ে
ভিক্ষা চাইছে—

ভিক্ষা দাও মা ভিক্ষা দাও,
আমি যে দুঃখিনী গরীব কাঙালিনী
করুণা করিয়া ফিরিয়া চাও ।
তোমাদের সবার দানে
বেঁচে আছি আজি প্রানে
খালি হাতে ফিরায়ো না
দিয়ে কিছু দাও ।।
ভিখারিনীর আগমন শুনে গৃহকর্ত্তী ভিক্ষা না দিয়ে উঠানে এসে বরং
বললেন—

‘চল বাড়ন্ত গো—এগিয়ে গিয়ে দেখো বাছা !’
ভিখারিনী শ্রান্ত গলায় বললো—

‘দশ বাড়িতে গেলাম তার মধ্যে ন’ বাড়ি থেকেই এক কথা বললো,
‘এগিয়ে গিয়ে দেখো।’ এগিয়ে গিয়ে আর কদর দেখি, বল মা।’

গৃহকর্তী বললেন—

‘কি আর করবে বাছা—এখানে যে হবে না।’

ভিখারিণী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো—

‘হা খোদা এখন কি করি?’

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা দেখো গৃহকর্তী বললো—

‘দেখো বাছা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে গেরস্তের অকল্যাণ করো না। ভিক্ষা
দিলাম না বলে আবার খোদাকে সাক্ষী মানা হচ্ছে।’

এমন সময় সেখানে একজন প্রতিবেশি এলো। সে জিজ্ঞেস করলো—

‘কী হলো খলিলের মা?’

গৃহকর্তী সঙ্গে সঙ্গে বললো—

‘দ্যাখো না, এই ভিখারিণী ভিক্ষে পায়নি তাই শাপমন্যি দিচ্ছে।’

ভিখারিণী সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের সাথে জবাব দিলো—

‘শাপমন্যি কখন দিলাম, মা! তোমার যেমন কথা।’

গৃহকর্তী রেগে গেলো—

‘আবার মুখের ওপরে জবাব দেয়া হচ্ছে। বেরো-বেরো আমার বাড়ি
থেকে।’

ভিখারিণী—

‘যাচ্ছি মা যাচ্ছি। তোমরা বড়ো লোক, তাই আমাদের এমন কুকুর
বেড়ালের মতন তাড়িয়ে দিতে পারো।’

প্রতিবেশিনী তখন ভিখারিণীর উদ্দেশে বললো—

‘ভিক্ষে মাগতে আমাদের মতো গরীব গেরস্তের বাড়িতে আসো কেন
বাছা? হাজী মুহসীনের বাড়ি চেনো না? সেখানে গেলে চাল-ডাল টাকা
পয়সায় আঁচল ভরে দেবে।’

গৃহকর্তী অবাক হয়ে প্রতিবেশিনীর কাছে জানতে চাইলো—

‘ওমা ভাই নাকি গো? তুমি কি করে জানলে?’

প্রতিবেশিনী বললো—

‘শোনো কথা-আমাদের উনি যে তার ওখানেই চাকরি করেন।’

গৃহকর্তী অনেকটা বিশ্বাসের সুরে বললো—

‘তবেতো তুমি জানবেই ভাই।’

প্রতিবেশিনী তখন উৎসাহে আরো বললো—

‘জানো ভাই, হাজী মুহসীন এমনিতে তো ধনী ছিলই তার উপর তার বোন মনুজান তার বিরাট জমিদারির বিষয় সম্পত্তি ধনদৌলত সব কিছু ভাইকে দিয়ে গেছেন। হাজী মহসীনের বড়ই দয়ার শরীর। তিনি কারো দুঃখ সহ্য করতে পারেন না। কেউ তার অভাবের কথা জানালে তাকে মুঠি মুঠি টাকা পয়সা, খাবার দাবার সব দিতে থাকেন।’

গৃহকর্তী অবাক হয়ে বললো—

‘বলো কি ভাই-এমন ভালো মানুষ আজো আছে পৃথিবীতে?’

প্রতিবেশিনী বললো—

‘পৃথিবীতে আছে মানে কি-আমাদের এ তল্লাটেই তো আছেন। তার দান-খয়রাত সম্পর্কে কত কাহিনী যে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে পড়ছে তার কোন হদিস নেই। সেদিন হয়েছে কি জানো? হাজী সাহেব রাতের বেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন সঙ্গে আমাদের উনিও আছেন। একটা কুড়ে ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি শুনতে পেলেন ঘরের ভেতরে ছোটো ছেলে পুলে ক্ষিধেয় কাঁদছে। মা বেচারী বিধবা-একাকী কি আর করবে বসে বসে কাঁদলো আর আল্লাহকে ডাকছিলো। হাজী সাহেব কান্না শুনতে পেয়ে সেই কুড়ে ঘরে গেলেন। বিধবা নারী হাজী সাহেবকে দেখে ঘোমটার আড়ালে মুখ লুকালো-তার কান্নাও থেমে গেলো।’

মুহসীন তার কাছ থেকে জানতে পারলেন তাদের ঘরে সামান্য চালডালও নেই যে ছেলেপেলেদের খেতে দেয়। শুনে মহসীনের খুবই দুঃখ হলো। তিনি ঐ ছেলে পেলে ও বিধবার উদ্দেশে বললেন—

‘কোনো চিন্তা করবে না-আমি তোমাদের খাবার নিয়ে আসছি। আর কোনোদিন যাতে এই ছেলেপেলেরা ক্ষুধায় কষ্ট না পায় সেজন্যে প্রতিমাসে আমি টাকা কার ব্যবস্থা করে দেবো।’

‘এই বলে মুহসীন বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই কিছু খাবার ও কয়েক বস্তা চাল আটা সেই বিধবার বাড়িতে মুহসীন পাঠিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়-ঐ বিধবা ও তার ছেলেপেলেরা আর কোনোদিন যেন খাবার দাবারে কষ্ট না পায় সেজন্যে তাদের জন্যে মাসোহারা নির্ধারন করে তা নিয়মিত পাঠাতে থাকেন।’

একথা শুনে গৃহকর্ত্রীর তাক্ লেগে গেল। সে বললো-

‘ওমা, তাই নাকি? খুব দয়ার শরীল তো?’

প্রতিবেশিনী আরও বললো-

‘চাকর বাকরদের ওপরও হুজুরের খুব অনুগ্রহ-সবাইকে তিনি নিজের ছেলের মতন স্নেহ-যত্ন করেন। শুনলেন, কেউ হয়তো রোগে অস্থির হয়ে ছটফট করছে-সেবা করার কেউ নেই। তিনি ছুটলেন ডাক্তার আর পথি নিয়ে। যেখানে দীন দুঃখী সেখানেই তিনি। এর মধ্যে চারদিকে হাসপাতাল, মন্ডব, ইস্কুল, এতিমখানা করে দিয়েছেন। অনেকগুলো পুকুর নানান জায়গায় কাটিয়ে দিয়েছেন এতে কত লোকের যে উপকার হচ্ছে তাই। কিন্তু ভাই, খোদা কি এমন ভালো লোককে বেশীদিন রাখবেন। শুনলাম, তার নাকি ভারী অসুখ।’

গৃহকর্ত্রী চিন্তিতভাবে বললো-

‘তবে তো ভাবনার কথা ভাই-তবু আমরা দোয়া করি তিনি যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং গরীব দুঃখীদের মাঝে আবার সেবায় রত থাকেন।’

হাজী মুহম্মদ মুহসীনের সময়কাল ১৭৩২ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অবস্থা স্থির ছিল না বরং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অস্থিরতা বিরাজ করছিল। কিন্তু সকল অস্থিরতার মধ্যেই হাজী মুহম্মদ মুহসীন নিজের লক্ষ্যে স্থির ও অবিচল

ছিলেন। তার রাজা হওয়ার স্বপ্ন ছিল না—তার লক্ষ্য ছিল মানব সেবা। তিনি তার মানব সেবার প্রতি অবিচল থেকেছেন।

তিনি ভোগ বিলাসী ছিলেন না। তার সময়ে যেখানে ব্রাহ্মণরা গোত্রের ভারে বা ধর্মের প্রভাবে ২০ জন থেকে ৫০/৬০ জন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতেন—সেখানে মুহসীনকে ব্রাহ্মণদের এ বহু বিয়ে প্রথা ভীষণ পীড়া দিতো। একজন পুরুষ ৫০ জন নারীকে বিয়ে করবে, এ যে নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ। তাছাড়া, মুহসীন মনে করতেন—এ ব্যবস্থা যে নারীদেহ ভোগেরই নামান্তর এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুহসীন ব্রাহ্মণদের প্রবর্তিত এ ধর্মীয় ব্যবস্থাকে দ্বিধার জানান। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বহু বিবাহ তো করেনইনি, জীবনে বিয়ে না করে চিরজীবন অবিবাহিত থেকে গেছেন। নিজের চিরকুমার জীবন দিয়ে ব্রাহ্মণদের তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ২০ জন ৫০ জন স্ত্রী তো দূরের কথা—স্ত্রী ছাড়াও জীবন সুন্দরভাবে কাটানো যায়।

মুহসীনের সময় আরো একটি বিষয় অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে যা মুহসীনকে খুবই পীড়া দিতো। সেটি হলো সতীদাহ প্রথা। কিন্তু বিষয়টি হিন্দুধর্মের বলে মুহসীন এ বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন নি। তবে স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে উঠিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে মারা, একথা যখনই ভাবতেন তখনই তার শরীর শিউরে ওঠতো। অবশ্য, অনেকেই হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি এবং আরও বিষয় নিয়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন—যাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ে়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, রাজা রামমোহন রায় হাজী মহসীনের সমসাময়িক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ে়ের সময়কাল ছিল ১৭৭২ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত।

হাজী মহসীনের সময় উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মুঘল সম্রাটদের আকাশ ছোঁয়া

ক্ষমতার অবসান হয়েছে। স্থানে স্থানে বিভিন্নজনে রাজা মহারাজা হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে ইংরেজ বেনিয়া দল সমগ্র উপমহাদেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তাদের ইচ্ছামতো শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। সুতরাং বলা চলে রাজনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বলতে কিছুই ছিল না বলা চলে। জোর যার মুলুক তার। চোর ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যায়। অপরাধের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। ক্ষেতের ফসলে উৎপাদনে ভাটা পড়ে। দেশে দেশে ফসল বিশেষ করে চালডাল ও অন্যান্য সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে অরাজক অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

এমন বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থার মধ্যে একদিকে হাজী মুহম্মদ মুহসীন অন্যদিকে রাজা রাম মোহন রায় মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। হাজী মুহসীন সমাজসেবী হিসেবে আর রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারক হিসেবে।

রামমোহন রায় নতুন ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা না করলেও প্রচলিত হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কারের প্রতি কঠোর আঘাত করেন। পৌত্তলিকতা বর্জন ও একেশ্বরবাদ যে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক অনুশাসন ও প্রচলিত শাস্ত্রবিধির বিরোধী হলে তা অমান্য করার নির্দেশ দেন।

এর প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজে যেমন, তার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজেও তেমনি প্রবল আকারে দেখা দেয়। এর ফলে একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট পরিবর্তন ধরা পড়ে, তেমনি ব্রাহ্ম সমাজ সর্বজনীন উদার ধর্মমতের আদর্শ পরিত্যাগ করে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

রামমোহন ইসলাম ও মুসলমানের অনেক কিছু উপাদান রূপে ব্যবহার করে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে এক গৌরবময় নবসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করেন। এটা সম্ভব হয় তার আংশিক কারণ-আত্মপ্রকৃতির ধর্মে হজরত

মুহম্মদ (দঃ) এর চরিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। আর ইসলামের ইতিহাসে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু স্বর্ণীয় যেমন-কোরআন, হজরত মুহম্মদের (সাঃ) জীবনী ও বাণী, মোতাজেলা দর্শন সুফী সাহিত্য, মুসলমানী সভ্যতা এ সমস্তের সঙ্গে তার গভীর পরিচয় হয়।

তিনি মুহসীনের সময়েই আরবী ও ফারসী ভাষায় বই লেখেন, ১৮০৩ থেকে ১৮০৪ সালে একেশ্বরবাদের ওপর তুহফাতুল মুয়াহহিদীন ‘একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার’ আরেকটা ‘জানাজারাতুল আধিয়ান’ বিভিন্ন ধর্মের ওপর আলোচনা।

তখন অর্থাৎ মুহসীনের সময় এমন অবস্থা ছিল যে, কেউ সমুদ্র পাড়ি দিলে তাকে জাতিচ্যুত করা হতো। অনেকে শাস্ত্র মতে প্রায়শ্চিত্ত করেও সমাজে স্থান পায়নি। এমনকি কেউ উচ্চ শিক্ষা বা চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে বিলেত গমন করলেও দেশে ফিরে এলে সে নিজ পরিবারে স্থান পেতো না।

আর হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা ছিল জঘন্যতম। এ প্রথা অনুসারে মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় সদ্য বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে ফেলা হতো। এ কে সহমরণ প্রথাও বলা হতো। এই প্রথা প্রাচীনকাল হতে এ উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্ট ধর্মের তিন চারশ বছর পূর্ব থেকে এদেশে সহমরণের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সতী হবার সংস্কার বা কুসংস্কার বহুদিন থেকেই চলে আসছিল। শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের সর্বত্রই। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এই প্রথা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশেই ঘটেছিল এ বাড়াবাড়ি। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ভারতবর্ষে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। আকবরের আমলেও সতীদাহ প্রথা দূর করার চেষ্টা করা হয়। বাংলা তথা ভারতের এই দুঃসহ ও নির্দুঃ প্রথাটির বিরুদ্ধে প্রথম পরিকল্পনা মাসিক বিরোধিতা শুরু করেন মিশনারী পাদ্রীগণ। বিদেশী শাসকগণও (যেমন লর্ড

কর্নওয়ালিস, মিন্টো প্রমুখ ।) এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তবে ঐ প্রথার বিলোপ সম্পর্কে কোনো সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে তারা ভীত ছিলেন । ঐ প্রথার বিলোপ ঘটালে ভারতীয়দের বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে এটা ছিল তাদের মূল ভয়-’

(উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা অজয়েন্দ্র নাথ সরকার ।)

সতীদাহের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বিধবাদের আত্মীয় ও অন্তর দেবতা দাহকালীন এই বিধবাদের প্রায় বেঁধে ফেলতেন এবং যেন তারা চিতা থেকে পালাতে না পারে এ জন্যে রাশিকৃত তৃণ-কাষ্ঠাদি দ্বারা তাদের দেহ আবদ্ধিত করতেন ।

বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা সহমরণ বেশি হতো । ১৭৯৯ সালে নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মণের ২২ জন স্ত্রী তার সাথে সহমৃতা হয় । ঐ সময়েই শ্রীরামপুরের এক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তার ৪০ জন স্ত্রীর মধ্যে যে ১৮ জন জীবিত ছিল তারা সকলেই সহমৃতা হয় । ১৮০৪ সালে কলিকাতার চারদিকে ৩০ মাইল সীমানার মধ্যে অর্থাৎ হুগলীরও প্রায় তিনশ’ বিধবা সহমৃতা হয় । সমাচার দর্পনের পরিসংখ্যান এরকম-

অঞ্চল	১৮০০	১৮০৫	১৮১০
কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী	২৫৩	৮৯	৪৪১
ঢাকা	৩১	২৪	৫২
মুর্শিদাবাদ	১১	২২	৪২
পাটনা	২০	২৯	৩৯
বেনারস	৪৮	৬৫	১০৩
বেরেলী	১৭	১৩	১৯
মোট	৩৮০	৪৪২	৬৯৬

রোগ শয্যায় শায়িত হাজী মুহম্মদ মুহসীন। শয্যার পাশে রজব আলী ও শাকের আলী উদ্ভিগ্ন হয়ে বসে আছেন। রজব আলী জিজ্ঞেস করলো—

‘এখন কেমন আছেন, হজুর?’

মুহসীন উদাসভাবে তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—

‘শরীরের অবস্থা ভাল নয় রজব আলী। আল্লাহ আমাকে ডেকেছেন। তার দরবারে হাজির হতে হবে। যাবার আগে এই বিষয় সম্পত্তির যে একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি, এতে আমি নিশ্চিত। আল্লাহর দরবারে সঠিক জবাব দিতে পারবো এটা আমার সান্ত্বনা।’

একটু থেমে রজব আলীকে উদ্দেশ করে বললেন—

‘রজব আলী!’

রজব আলী একটু নুইয়ে পড়ে বললো—

‘হুকুম করুন হজুর।’

মুহসীন বললেন—

‘ইমামবাড়ার ব্যবস্থাপনা আজও শেষ করতে পারলাম না, এই আফসোসটা আমার মনে সবচেয়ে বেশি আঘাত করছে। তুমি আর শাকের আলী আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তোমাদের দু’জনকে আমি মোতোয়াল্লী নিযুক্ত করেছি। তোমরা ইমামবাড়ার ব্যাপারটা শেষ কর। যেন আমি মরেও শান্তি পাই।’

রজব আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো—

‘আপনি দুশ্চিন্তা করে আপনার শরীর মন খারাপ করবেন না। আপনার হুকুম সসম্মানে যথাযথ পালিত হবে জনাব।’

মুহসীন এবারে শাকের আলীর দিকে তাকালেন, বললেন—

‘শাকের আলী।’

শাকের আলী সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে সাড়া দিলো—

‘আদেশ করুন, হজুর।’

মুহসীন ধীর গলায় বললেন—

‘জমিদারীর সমস্ত আয় যে আমার দেশের গরীব দুঃখী ও অভাবীদের জন্য দান করতে পেরেছি, এতে আজ কি ভাল যে লাগছে তা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সমস্ত দেশ জুড়ে আমার দুঃখী ভাই বোন অভাবের তাড়নায় হাহাকার করছে। হে দয়াময় আল্লাহ, তুমি এই দুঃখীজনদের দয়া করো। এরা যেন দু’বেলা পেট পুরে খেতে পারে। নিজেরা মুখ হয়ে জীবনভর অশেষ কষ্ট ভোগ করেছে—এদের সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ করে দিও।’ শাকের আলী মুহসীনকে কথা বলতে বাধা দিয়ে মাঝখানে বলে ওঠলো—

‘হজুর, ডাক্তার আপনাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, আপনি দয়া করে একটু চুপ করে থাকুন।’

মুহসীন যেন অনেকটা বেপরোয়া, বললেন—

‘ডাক্তারের কাজ ডাক্তার করেছে কিন্তু আজ আমি আর ডাক্তারের কথা রাখতে পারছি না। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে এটা ডাক্তার বুঝতে না পারলেও আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাই শেষ কথাগুলো আমাকে বলে যেতেই হবে। শাকের আলী, রজব আলী তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে বোন মনুজানের কবরের পাশে কবর দিয়ে।’

শাকের আলী সঙ্গে সঙ্গে বললো—

‘হজুর, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তবে, এসব নিয়ে এখনই আপনি ভাবছেন কেন—আপনি একটু শান্ত হোন।’

মুহসীন আবার রজব আলীকে সম্বোধন করে বললেন—

‘রজব আলী?’

রজব আলী অনেকটা ব্যথিত চিন্তে জবাব দিলো—

‘আদেশ করুন হজুর।’

মুহসীনের গলার স্বর এবারে আর্ত শোনালো—

‘একটা মিনতি তোমাদের কাছে। কখনো পথভ্রষ্ট হয়ো না। মনে

রাখবে অর্থ অর্থ এই অর্থই সকল অনর্থের মূল। অনর্থের জন্যে তোমাদের মধ্যে বা কারোর সাথে যেন বিবাদ বিচ্ছেদ না ঘটে। আমার কোনো কাজ যেন ক্ষতি না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমার কাজ ক্ষতি হওয়া মানেই গরীব-দুঃখী ভাই বোনদের ক্ষতি হওয়া। আঃ আঃ বুকের ভেতর হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠলো কেন? উঃ উঃ।’

শাকের উদ্ভিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো—

‘একটুখানি বেদনার রস দেব হজুর?’

মুহসীন বেদনায় কাতরাছেন।

রজব আলী তা লক্ষ্য করে বললো—

‘হেকিম সাহেবকে কি ডেকে নিয়ে আসবো?’

মুহসীন বললেন—

‘না-না হেকিম ডাক্তারের দরকার নেই—আমাকে খোদার নাম নিতে দাও—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।’ মুহসীন কিছুক্ষনের মধ্যে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো দানবীর, দয়ালু, মানবপ্রেমী হাজী মুহম্মদ মুহসীন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এলো। সবাই হায় হায় করে বলতে লাগলো—হায় এ কি হলো, হায় একি হলো! আমাদেরকে এতিম করে মুহসীন চিরতরে পরপারে চলে গেলেন। এখন কে আমাদের দেখবে—কে আমাদের দুঃখ বুঝবে। সর্বত্র কান্নার রোল পড়ে গেলো।

দলে দলে হাজার হাজার শোকাহত মানুষ ইমাম বাড়ার দিকে ছুটতে থাকে তাদের প্রিয় মানুষ মুহসীনকে এক নজর দেখার জন্যে। লাইন করে হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশু মুহসীনকে দেখে দেখে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়।

দাফনের সময় কয়েক লাখ লোকের সমাগম হয়। মুহসীনকে দাফন করার পর লক্ষাধিক লোক প্রাণভরে এই দোয়া করে আল্লাহ চান-জার

বেহেশ্ত নসিব করেন ।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন পরোপকারী । অত্যন্ত দানশীল ও দয়াশীল ছিলেন । ভারতবর্ষের অনেক রাজা বাদশাহও প্রজাকূলের জন্যে অনেক জনকল্যাণ মূলক কাজ করেছেন । সম্রাট অশোক, ফিরোজ শাহ এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

কিন্তু এরা রাজা বাদশাহ ছিলেন । অগাধ ধন সম্পদের মালিক ছিলেন তারা হাজী মুহসীন তাদের মতো রাজা বাদশাহ ছিলেন না, তাদের মতো অগাধ ধন সম্পদের মালিক তিনি ছিলেন না । হাজী মুহসীন তার সীমিত ধনসম্পদের সবটুকুই গরীব দুঃখী দুঃস্থদের জন্যে দান করে গেছেন ।

রাজা-বাদশাহরা জন কল্যাণমূলক কাজ করলেও নিজেদের অভিজাত্য বজায় রেখেই দান খয়রাত করেছেন । নিজেদের বিলাসী জীবনকে তারা পরিত্যাগ করেননি । কিন্তু হাজী মুহসীন বিলাসী জীবন মোটেই পছন্দ করেননি । কখনও বিলাসী জীবনের মুখাপেক্ষী হননি । তিনি গরীব-দুঃখীদের মতোই সরল সহজ ও সাধারণ জীবন যাপন করেছেন । গরীব দুঃখীদের সেবা করায় বাধা আসতে পারে সেজন্যে তিনি বিয়ে করে সংসার পাঠেননি । তার বোন মনুজান তাকে বারবার অনুরোধ উপরোধ করার পরও তিনি তার প্রস্তাবে রাজি হননি । বোনকে তিনি অকপটে জানিয়েছেন যে, তিনি তার জীবন গরীব দুঃখীদের জন্যে উৎসর্গ করেছেন ।

কোনোদিন কোনো নারীর প্রতি আসক্ত হননি । মদ সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েননি । সারাক্ষণ আল্লাহ রসুলকে স্মরণে রেখে ধর্মের পথে চলায় সচেষ্ট থেকেছেন ।

তিনি এতটাই মানুষকে ভালবাসতেন যে, রাতে না ঘুমিয়ে ছদ্মবেশে বের হতেন-মানুষের অবস্থা জানতে । অন্ধকারে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন তাদের অবস্থার কথা । যেখানেই তিনি জানতে পারতেন দুঃখ ও অভাবের তাড়নায় তারা কষ্ট পায় । সেখানেই তিনি নিজ হাতে খাদ্যদ্রব্য ও টাকা পরস্যা দিয়ে আসতেন ।

যদি কোনো বাড়িতে রোগীর ঝোঁজ পেতেন-তিনি ঢুকে পড়তেন সে বাড়িতে, দিবারাত্র সে রোগীর সেবা করতেন। নিজের শ্রম দিয়ে, সেবা দিয়ে, টাকা পরসাদা দিয়ে, ডাক্তার, ঔষুধ পত্র দিয়ে সাহায্য করতেন। সে রোগী সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত মুহসীন সে বাড়ির সংস্পর্শ ছাড়তেন না।

কোথাও কোন সংঘর্ষ হলে মুহসীন সে সংঘর্ষের নিষ্পত্তি করে দিতেন। ঝগড়া ফেঁসাদ মারামারি করা যে ভাল নয় একথা বুঝতেন।

প্রতিটি মানুষ মুহসীনকে ভালবাসতো-শ্রদ্ধা করতো, মুহসীনকে আপনজন ভাবতো। এমন কোনো বিয়ে হতো না যে বিয়েতে মুহসীন উপস্থিত না থাকতেন। হিন্দুর হোক আর মুসলমানেরই হোক বিয়ের যাবতীয় খরচ মুহসীন বহন করতেন। মুহসীন যতদিন বেঁচেছিলেন বিশেষ করে ছগলীকে বয়স্থা কোনো মেয়ের বিয়ে দিতে বাপ মায়ের দুর্ভাবনা বা চিন্তা হয়নি। কারণ, তারা মুহসীনকে জানিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে মুহসীন বিয়ের সব ব্যবস্থা করেছেন; নিজে উপস্থিত থেকে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে তবে বাড়ি গিয়েছেন।

মুহসীন বেঁচে থাকতেই 'মুহসীন ট্রাস্ট' গঠন করে, (১৮০৬)। ট্রাস্টের টাকার পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। যা বর্তমান সময়ে কয়েক কোটির সমান। এই টাকার সাহায্যে আজ পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে সাদী, লোকজনের চিকিৎসা, স্কুল-কলেজ মাদ্রাসা, মন্ডব, মসজিদ ইত্যাদি চলছে।

এমন দয়াল মানবপ্রেমী ও দানশীল মানুষ ইতিহাসে সত্যি বিরল।